চমস্কি ভোগবাদ, পুঁজিবাদ ও ভোগ-বিলাসের এই কুফল তুলে ধরেছেন এভাবে : “Keep the public busy, busy, busy, with no time to think; back on the farm with the other animals.” (খান)।

অতএব, ‘ফানা আনিল হাওয়া’ মানুষকে দিতে পারে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, অল্পে তুষ্টি ও অপরের কল্যাণ সাধনের মন-মানসিকতা। ভোগবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ডেকে আনে মানুষের জন্য অকল্যাণ, অশান্তি, উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা। অপরদিকে, ‘ফানা আনিল হাওয়া’ অকল্যাণ, অশান্তি, উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর করে শান্তি ও কল্যাণের আবহ তৈরি করে। ‘ফানা আনিল হাওয়া’ চর্চার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে সংঘাত ও যুদ্ধ চলমান তার ইতি টানা সম্ভব। আর খাদ্য সংকট মোকাবিলায় এটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

কুশাইরি, আবুল কাশিম আব্দুল করিম. *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*. Translated by সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, vol 1, সিলেট, খানকায়ে আমিনীয়া আসগরিয়া, ২০১৭.

আল-হোসাইনী, ইউসরি রুশদি জাবুর, *ফতহুর রহমান ফি শারহি মুতুনে আহলিল ফিকহি ওয়াল ইরফান*, *প্রথম সংস্করণ*, কায়রো, ২০২২

হোসাইন, সৈয়দ দেলাওর, বেলায়তে মোত্‌লাকা, চট্টগ্রাম : সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী, ২০০৯

মিশকাতুল মাসাবীহ : হাদিস নং-৩০৮০,

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68407, Accessed 21 December 2022.

কসিদায়ে বুরদা হতে রুহানি চিকিৎসা, আল-মদিনাতুল ইলমি মজলিশ, দাওয়াতে ইসলামি।

খান, ফজলে রাব্বি.“ভোগবাদের ফাঁদ”. *Barta24*, 21 May 2019

লেখক :

প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

দিলোয়ারা জাহান মেমোরিয়াল কলেজ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম;

রিসার্চ ফেলো, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

The Role of 'Gausiat Niti' in Eliminating Corruption

✍ Sarwar Kamal

One of the most pressing crises in the world today is corruption and it damages a person's life as well as the economic performance of countries in a broad sense (Dal Bó, E., & Rossi, M. A. (2007). Most of the persons holding the power engaged in this kind of dishonesty which led them to commit big crimes in the temporal life and it led the persons to face punishment in the eternal life, a belief as being a Muslim.

Religious laws prohibit people from committing crimes in their temporal lives, yet tragically, the majority of us disobey the laws. Religious leaders lead us in good deeds and forbid us from evil deeds in this life so that we would be secure in the next.

Bangladesh, a South Asian country with a rapidly expanding economy after its independence in 1971, is home to diversified development initiatives as well as some corruption in the public and commercial sectors (Rahman, M., & Rahman, A. (2022).

Bangladesh has been developing, yet corruption is still a problem everywhere. In Bangladesh, corruption is rampant despite efforts. Despite the administration's rhetoric against corruption at all levels, tales of well-known politicians being linked to a variety of scandals involving accusations of misconduct continue to emerge (Rahman, M., & Rahman, A. (2022).

However, the Bangladesh government is trying to eliminate corruption in the country and the government formed the Anti-Corruption Commission in 2004 to prevent corruption. But the commission reportedly failed to prevent corruption in the country as it is spread widely.

Moreover, the non-government organizations based in Bangladesh are also trying to eliminate corruption to ensure good governance in the country.

The saints, who are regarded as the representatives of the Prophet (Sallallahu Alayhi Wa'sallam), thought it many years before we did for the betterment of ourselves, community, and country.

Here, I am introducing the discussion on some principles adopted by Gausul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) (1826-1906), a great sufi saint in South Asia, for his followers. The principles are meaningfully considered as the most effective strategy of eradicating corruption in the society.

Though the principles were not directly written by Gausul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) but these were accumulated by his (Gausul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) only one successor Syed Delawor Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) (1893–1982).

Additionally, in terms of time, Syed Delawor Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) succeeded Gausul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) as the Maizbhandari pir. Syed Delawor Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) is well-known for his academic bent and for his writings that elaborate on the theosophy of the movement and extend Gausul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz)'s views. He is thought to be the Maizbhandari pir with the most knowledge (Bertocci, P. J. (2006).

The principles titled as ‘Gausiat Niti’ by Syed Delawor Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz), where he mentioned about the views, lifestyle, sufi practices of Gausul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) (Manob Sobhyata, December 1974).

There are three types of ‘Gausiat Niti’ and these are ‘Fana Anil Khalak (annihilation from creations)’, ‘Fana Anil Hawa (annihilation from meaninglessness)’, and ‘Fana Anil Erada (annihilation from own will) (Usul-e-Sab’a (2020).

I mentioned earlier that the principles (Gausiat Niti) are meaningfully considered as the most effective strategy of eradicating corruption in society. Now I am providing my views on it. Before that I want to mention that I will discuss two principles : ‘Fana Anil Khalak’ and ‘Fana Anil Hawa’.

'Fana Anil Khalak’ is defined as the way of judging someone by himself or herself by meditation in terms of past and ‘Fana Anil Hawa’ is defined as the way of being dependent on his or her own income (Manob Sobhyata, December 1974).

Those who meditate on the past must see his or her crime in front of them, which will stop him or her from doing bad things in the future. Those who rely on their own income for their livelihood and are greedy must avoid corruption.

Syed Emdadul Hoque Maizbhandari, the incumbent pir of Maizbhandar Darbar Sharif, teaches and directs to his followers to obey the (Gausiat Niti) and to implement these principles to their temporal life so that the followers may avoid punishment in the eternal life.

Those who seriously obey and follow his pir’s (Syed Emdadul Hoque Maizbhandari) direction, can they commit crime? Obviously not. Moreover, those who don't follow his or her pir’s direction in life are considered as followers? Here the answer also, obviously not.

There is nothing more to explain but obeying and implementing the ‘Gausiat Niti’ in his or her life must bar

him or her in committing corruption. Here, one more thing : who can follow the 'Gausiat Niti'? Is it only for the followers of Maizbhandari tariqa? The answer is negative and the 'Gausiat Niti' is for all as there are no religious bindings on the principles and Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) is not only for Muslims but for all which is proven by his title 'Gausul Azam'.

If people are to live according to the "Gausiat Niti," they must avoid corruption, which will make people impeccable.

References :

Dal Bó, E., & Rossi, M. A. (2007). Corruption and inefficiency : Theory and evidence from electric utilities. Journal of Public Economics, 91(5-6), 939-962.

Rahman, M., & Rahman, A. (2022). Curving Corruptions in Government Sectors : The Role of Anti-Corruption Commission (ACC) in Bangladesh.

http://acc.org.bd (accessed on Jaunary 07, 2023)

Bertocci, P. J. (2006). A Sufi movement in Bangladesh : The Maijbhandari tariqa and its followers. Contributions to Indian Sociology, 40(1), 1-28.

Syed Delawor Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) (1974), Manob Sobhyata, Published by Syed Emdadul Hoque Maizbhandari, (Page-9)

Usul-e-Sab'a (2020), Published by Darul Irfan Research Institute (DIRI), (Page-171)

Author :
Lecturer, Department of Journalism & Media Studies,
BGC Trust University Bangladesh,
Press & Publication Secretary
Chattogram Union of Journalists (CUJ)

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ফানা আনিল হাওয়া'র চর্চা

✍ মুহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা তানভীর

বর্তমানে চলছে প্রযুক্তির রাজত্ব। আধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করে দিয়েছে। বিশ্ব আজ প্রযুক্তি নির্ভরতার এমন এক সময়ে এসে উপনীত হয়েছে, যে শিশুটি আজকে জন্মগ্রহণ করেছে সেও আধুনিক প্রযুক্তির বাইরে নয়।

যে কোনো আবিষ্কারের বরাবরই দুটি দিক রয়েছে। একটি ভালো, অপরটি মন্দ। প্রযুক্তিরও তাই। কেউ এটির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বজয়ী হচ্ছে, কারও আবার নীতি নৈতিকতার পদস্খলন হচ্ছে। তাই প্রযুক্তির ব্যবহারকে যথাযথ করতে 'ফানা আনিল হাওয়া' চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

আর যা না হলেই চলে, সেরূপ কাজকর্ম, কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে জীবনযাত্রাকে সহজ ও ঝামেলা মুক্ত করাই 'ফানা আনিল হাওয়া'।

গত ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার একটি প্রতিবেদন আমাকে বিমোহিত করেছে :

রুবেল মিয়া, সরকারের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। তিনি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে ডাক্তারের পরামর্শে পরীক্ষা নিরিক্ষা করালেন। রিপোর্টে তার ত্বকের ক্যান্সার ধরা পড়ে। তাঁর বড়ো ছেলে শুভ রিপোর্ট দেখে বললেন, বাবা! চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধে নামেন শুভ। এই যুদ্ধে তার কার্যকর হাতিয়ার আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম উপহার ফ্রিল্যান্সিং। তিনি ইউটিউব থেকে দেখে 'মোশন গ্রাফিক্স ও থ্রিডি অ্যানিমেশনে'র কাজ রপ্ত করেন। এরপর ইন্টারনেটে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের কাজ দেওয়া-নেওয়ার বিভিন্ন সাইটে কাজ শুরু করলেন। এভাবে চেষ্টা করার এক পর্যায়ে তিনি যুক্তরাজ্যের এক আইটি কোম্পানি থেকে কাজ পেয়ে যান। তাদের সাথে আড়াই হাজার ডলারের বিনিময়ের একটি কাজের চুক্তিবদ্ধ হলেন। এরপর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে

তাকাতে হয়নি। ফ্রিল্যান্সিং থেকে করা আয় দিয়ে তিনি তার পিতাকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুললেন।

অন্যদিকে সাম্য নামের এক কিশোর। সে এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়েছিলো। গোটা পরিবার তার সাফল্যে উৎফুল্ল ছিলো। এবার সে এইসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেলো সে আশানুরূপ ফলাফল করেনি। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলো, কেন এমন হলো? সে বাজে আড্ডা দেয় না, ধূমপান করে না, সন্ধ্যায় সিঁড়িতে বসে বন্ধুদের সাথে গুলতানি মারে না। যথার্থ অর্থে সে ভালো ছেলে। তারপরও সে রেজাল্ট ভালো করলো না। পরিশেষে জানা গেলো, সে কলেজে ভর্তির পর হতে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। রাতজেগে ফেসবুকিং করে, পরিচিত অপরিচিত সকলের সাথে গল্পে মত্ত থাকে। একারণে সে দিনের বেলায় পড়াশোনায় আর মনোযোগ দিতে পারতো না। যার ফলে তার রেজাল্ট ভালো হয়নি। দেখা গেলো, প্রথম ঘটনার শুভ ছেলেটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা পরিহার করে, যে কাজে তার ব্যক্তিগত ও পরিবারের উপকার সাধন হবে তা শিখে এবং সেটাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফল হয়েছে।

অন্যদিকে, সাম্য প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছু অনর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তায় জড়িয়ে যাওয়ার ফলে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে পারেনি।

এখানে শুভ তার ব্যক্তি জীবনে 'ফানা আনিল হাওয়া' নীতির যথাযথ অনুসরণে সফল হয়েছে; আর সাম্য অনুসরণে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আশাহত হতে হয়েছে।

তারা নয় শুধু, প্রত্যেকটা মানুষই যদি নিজ জীবনে সফলতার শীর্ষে পৌঁছাতে চায় তা হলে 'ফানা আনিল হাওয়া' চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

এটি ছিলো যুগে যুগে সুফিয়ায়ে কেরামের আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম উসুল। আর এ নীতির চর্চা তাঁরা হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র জীবন থেকেই নিয়েছেন। নবুয়ত লাভের পূর্বেই 'ফানা আনিল হাওয়া'র চর্চা প্রিয় নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনে পাওয়া যায়। তিনি পৃথিবীর অপ্রয়োজনীয় সবকিছু ত্যাগ করে মক্কার অদূরে হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। সেখানে ধ্যানরত অবস্থাতেই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। জীবনের প্রত্যেকটি

পর্যায়ে এ নীতির বাস্তবায়নের ফলে তিনি এমন এক মকামে গিয়ে উপনীত হন, তিনি নিজ হতে কোনো কথায় বলতেন না, যা বলতেন তা আল্লাহ্‌র কথায়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

অর্থাৎ, তিনি নিজ প্রবৃত্তি হতে কোনো কথা বলেন না। যা বলেন তা তো কেবল অহি, যা তার প্রতি অহিরূপে প্রেরিত হয়। (সূরা আন নজম : ৩, ৪)

আধুনিক প্রযুক্তি এখন আর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। জীবনের সবকিছুতেই যেমন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো চাই, ঠিক তেমনি আমাদের লক্ষ্য রাখা চাই যে, দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, রবের অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে না তো? আমরা যা-ই করি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা তো একমাত্র তিনিই। ইরশাদ হচ্ছে,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তা প্রত্যক্ষকারী। (সূরা বাকারা : ২৩৩)

আর ইসলামের প্রকৃত অনুসারী সেই ব্যক্তি যে অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ."

حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٣١٨] ، ابن ماجه [رقم:٣٩٧٦].

হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত :

তিনি বলেন-হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

“অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির প্রকৃত ইসলাম।”

[হাদিসটি হাসান। তিরমিযী : ২৩১৮, ইবনে মাজাহ : ৩৯৭৬]

অতএব, ‘ফানা আনিল হাওয়া’র চর্চা যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারেও নিয়ে আসতে পারি, তা হলে আমাদের জীবনের অনেক মূল্যবান সময়কে আমরা সম্পদে পরিণত করে একটি সুন্দর সমাজ রাষ্ট্র বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারি।

লেখক :

লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

‘ফানা আনিল এরাদা’র স্বরূপ ও তাৎপর্য

✍ মুহাম্মদ মিশকাতুল ইসলাম

খাদেমুল ফোক্‌রা মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী “ফানা আনিল এরাদা”-র ব্যাখ্যায় বলেছেন, খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যাহার ফলে সুফি মতে ‘তছলীম ও রজা’ হাছেল হয়। (বেলায়তে মোত্‌লাকা, পৃষ্ঠা-৭৩, DIRI সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.)

মহান খোদার এ জগৎ সংসারে সকল সৃষ্টিই সদা তাঁর নির্দেশ পালনে বাধ্য। চাঁদ-সূর্যের আবর্তন, খুঁটি বিহীন আকাশের স্থিরতা, মেঘমালার স্থানান্তর, সমুদ্রে নিয়ন্ত্রিত জোয়ার-ভাটা, জঙ্গলের হিংস্রদানব লোকালয়ে না আসা ঐ নির্দেশেরই বহিঃপ্রকাশ। সে সাথে আশরাফুল মাখলুকাত তথা মানবজাতিও হুকুম পালনে মহান রবের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; তবে সাময়িক স্বাধীনতা পাওয়ায় অনেকেই মনে করছে তাদের পাকড়াও করার কে আছে? নফ্‌সের পূজারি হয়ে নিজ ইচ্ছায় গুনাহে লিপ্ত; তবে এ কথা ভুলে যাওয়া সমীচীন নয় যে, আমরা হলাম বিক্রীত গোলাম। অনুগত বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কিছু নাই। আর তেমনটিই পবিত্র কুরআনে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মু‘মিনদের থেকে তাঁদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। (সূরা তাওবাহ : ১১১)

বোঝা যায় আমাদের প্রাণ ও সম্পদ পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা ক্রয় করে নিয়েছেন; তবে যে প্রাণ শরীরে রয়েছে তা মূলত বিক্রীত; যা নিজ ইচ্ছায় চলা শাস্তি যোগ্য অপরাধ । মালিকের ইচ্ছায় চলা আবশ্যক। আর যে প্রাণ মালিকের ইচ্ছায় চলে সে প্রাণ অপর-কোনো সৃষ্টির দিকে মুখাপেক্ষী নয়।

এবার আসুন ইচ্ছার প্রকরণ বিশ্লেষণ করি ইচ্ছা বা এরাদা বিশেষত দু' ধরনের : প্রথমত : সকল সৃষ্টির ইচ্ছা, দ্বিতীয়ত : আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আল্লাহ্‌র বাণী :

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা তাকবির : ২৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে, হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন ,

قرأت فى سبعة وثمانين كتابا مما أنزل الله على الأنبياء : من جعل الى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر

অর্থাৎ, আমি (হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সাতাশিটি আসমানি কিতাব (সহিফা) পড়েছি যা বিভিন্ন নবির উপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। সেখানে রয়েছে : যে নিজ ইচ্ছায় নফ্‌সের তাড়নায় কিছু করে সে প্রকারান্তরে কুফুরি করলো। (তাফসিরে কুরতুবি : সূরা তাকবির : ২৯)

উপর্যুক্ত আয়াত ও তাফসির আমাদের জানান দেয় সৃষ্টিতে নিজ ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কিছুই নাই। যিনি নিজ ইচ্ছার কোরবানি দিতে পারেন তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বেলায়তের মুকুট দান করেন।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রাধান্যের এ আদব অলিগণ শিক্ষা নিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবি ও পূর্ববর্তী নবীদের থেকে; যেমন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ : বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব । (সূরা আনআম : ১৬২)

এ আয়াতে নামায, কোরবানি, পরিপূর্ণ জীবন ও মৃত্যু সকলই আল্লাহ্‌র জন্য এর দ্বারা এ বস্তু চতুষ্টয় বান্দার ইচ্ছাধীন নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায় ।

অর্থাৎ- মন চাইলে নামায পড়বে, মন চাইলে নামায ছাড়বে; এরুপ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ; অনুরূপ কোরবানিও। নামায ও কোরবানিতে বান্দাহ যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় চলতে বাধ্য থাকে তবে কেন সমগ্র জীবনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রাধান্য না দিয়ে নিজ ইচ্ছায় চলে? এখানেই সাধারণ আর অসাধারণের মাঝে পার্থক্য। দুনিয়ালোভী মানুষ ও আল্লাহ প্রেমিক অলিদের তফাত।

"তাসাউফ কি হাকীকত"- কিতাবে দু'জন মহান অলির কথোপকথন পড়েছি। তাঁরা একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করেন,"আপনি কখন খুশি থাকেন?" উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় তখন। তিনি প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কখন খুশি থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমার দোয়া আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দেন তখন খুশি হই । প্রশ্নকারী বিচলিত হয়ে বলেন, কেন? উত্তরে তিনি বলেন, সে সময় আমি অন্তরে প্রশান্তি পাই এ বলে যে, উক্ত ফরিয়াদে আমার ইচ্ছার উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রাধান্য পেয়েছে । সুবাহানাল্লাহ, এরই নাম 'ফানা আনিল এরাদা'।

'ফানা আনিল এরাদা'-র একটি বৈশিষ্ট্য হলো, سقوط الاوصاف المذمومة

তথা নিকৃষ্ট স্বভাবসমূহ পরিত্যাগ; যেমন : ইমাম আবুল কাসিম আবদুল কারিম ইবনে হাওযান আল-কুশাইরি আন-নিশাপুরি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি (৩৭৬-৪৬৫ হিজরি) বলেন,

من عالج اخلاقه فنى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر

অর্থাৎ : যে (সৎ) চরিত্রের অনুশীলন করবে তাঁর কলব থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য, লোভ, রাগ, অহংকার সবই ধ্বংস বা নিঃশেষ হয়ে যায়। (আর রেসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ১৬৭)

প্রত্যেক আল্লাহ্‌র অলি এ অযাচিত দোষসমূহ থেকে পাক পবিত্র। হযরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ তাঁরই উজ্জ্বল উপমা। এ ছাড়া 'ফানা আনিল এরাদা'র ধারক-বাহকগণ পার্থিব লোভ-লালসা থেকে পবিত্র। এরই প্রোজ্জ্বল চিত্র প্রিয় নবির সাহাবাদের মাঝেও বিদ্যমান ছিলো; যেমন : মক্কা মুকার্‌রমা বিজয়ের পর সাহাবাদের মাঝে গনিমতের মাল বণ্টনকালে আনসার সাহাবাগণ বললেন, আমরা তরবারি চালিয়ে বিজয়ী হলাম যার চিহ্ন তলোয়ারে লেগে আছে।

তথাপি গনিমতের মাল পাচ্ছে নও মুসলিম মক্কার কুরাইশরা। এ কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে আনসার সাহাবাদের ডেকে বললেন,

اولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم و ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو سلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم

অর্থাৎ : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন গনিমতের মাল নিয়ে তাঁদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসুলকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরবে । যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি (নবিও) আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব। (বুখারি শরিফ; কিতাবু মানাকিবিল আনসার : হাদিস নং -৩৭৭৮)

উল্লেখিত হাদিস শরিফ থেকে সে কথাই স্পষ্ট হয়, যার সম্পদ প্রয়োজন সে সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরবে। আর যার নবি প্রয়োজন সে সম্পদ ছেড়ে দিয়ে নবিকে নিয়েই ঘরে ফিরবে। অনুরূপভাবে, এ পৃথিবীতে যে নিজ ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে চলবে তার ছায়া-কায়া থাকবে ষাট থেকে সত্তর বা একশ বছর। আর যে খোদার ইচ্ছার সামনে নিজ ইচ্ছার কোরবানী দেয় তাঁর ইন্তেকালের পরও পৃথিবীতে তাঁর শান-মান, আজমত দিন-দিন বাড়তে থাকে এবং তাঁকে আল্লাহ অমর করে রাখেন।

ইচ্ছা শক্তি উৎর্সগকারীর হাল-হাকিকত কেমন হবে তার একটি উপমা তাসাউফের কিতাবে লক্ষ করা যায়; যেমন : আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে ,

وقد ترى الرجل يدخل على ذى سلطان أو محتشم فيذهل عن نفسه وعن اهل مجلسه هيبة وربما يذهل عن ذلك المحتشم حتى اذا سئل بعد خروجه من عنده عن اهل مجلسه وهيئات ذلك الصدر وهيئات نفسه لم يمكنه الاخبار عن شيئ قال الله تعالى : فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن (يوسف :) ولم يكن ملكا فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق فما ظنك بمن تكاشف بشهود الحق سبحانه؟

অর্থাৎ- বাদশাহ-র নিকট উপস্থিত ব্যক্তির ভয় ও লজ্জা এতই বেশি থাকে যে, পরক্ষণে তৎস্থল থেকে বের হওয়ার পর তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর নিকট কে ছিলো? সে প্রকম্পন ও ভয়ের কারণে সঠিক অবস্থা বর্ণনা দিতে পারবে না। যেমনটি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, মিশরের রমণীরা তাঁকে (হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে) দেখে তাকবির বলে তাদের হাত কেটেছিলো। তিনি কিন্তু ফেরেশতা ছিলেন না তৎসত্ত্বেও এক সৃষ্টি(রমণী) অন্য সৃষ্টি (হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম) কে দেখে যদি এভাবে নিজ অস্তিত্ব ভুলে যায় তা হলে হাকিকি রব যাদের সামনে প্রকাশিত হয় তাঁরা কি আর নিজের মাঝে নিজেকে দেখে ? (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : পৃষ্ঠা : ১৬৮)

না নিজের মাঝে খোদাকে উপলব্ধি করে। তাই তাঁরা নিজ ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করে দেয়। হযরত শিবলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

ذكر المحبة يا مولاي أسكرني + وهل رأيت محبا غير سكران

ভাবার্থ : আপনার মুহাব্বতের স্মরণ, হে আল্লাহ! আমাকে পাগল করেছে, পাগলহীন কি কোন প্রেমিক দেখা যায়? (মুকাশিফাতুল কুলুব : পৃষ্ঠা- ৩৩)

'ফানা আনিল এরাদা'-র ফলাফল :

সুফি মতে, 'ফানা আনিল এরাদা' দ্বারা তাসলিম ও রজা হাছিল হয়। রজা অর্থ সন্তুষ্টি। মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনই সকল সৃষ্টির কাম্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুখে তা সকলে মানলেও বাস্তব কর্মে তা অনেকে অনুসরণ করে না। আর যারা অনুসরণ করে তাঁরা সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে যায়। আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

ভাবার্থ : আত্মাকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করো যেন তাকদিরের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ জিজ্ঞেস করে, বলো বান্দাহ! তোমার সন্তুষ্টি কীসে?

এ জন্য জীবনের সফলতার সারাংশ হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। শুধু পৃথিবীতে নয়, জান্নাতিগণ জান্নাতে যাওয়ার পরেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাইবে এবং তা পাবেও। যেমন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের জিজ্ঞেস করবেন,

يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا اعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأى شئ أفضل من ذلك؟ فيقول احل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا

অর্থাৎ হে জান্নাতিগণ! তাঁরা বলবেন, হে আমাদের পালনকর্তা ! হাযির, আমরা আপনার খিদমতে হাযির। এরপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছো? তাঁরা বলবেন, কেন খুশি হবো না? আপনি আমাদের এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টিজগতের আর কাউকেই দান করেন নি। তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদের দান করব। তাঁরা বলবেন, হে আমাদের পালনকর্তা, এর চেয়েও উত্তম সে কোন বস্তু? আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করবো। অতঃপর আমি আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না। (বুখারি শরিফ; কিতাবুর রিকাক : হাদিস নং - ৬৫৪৯)

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, জান্নাতের চেয়েও বড়ো মূল্যবান নিয়ামত হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। যা জান্নাতিদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর দান করবেন । আর সে সন্তুষ্টিই কামেল অলিগণ ‘ফানা আনিল এরাদা’র মাধ্যমে দুনিয়ায় অর্জন করে থাকেন ।

উল্লেখ্য যে, এ মহা মূল্যবান পরিভাষা “ফানা আনিল এরাদা” তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীর অন্যতম উসুল। খোদা প্রাপ্তির বে-কিনারা এ মহাসাগরে নিজ ইচ্ছার বিনাশ ঘটিয়ে প্রেমের সমুদ্রে স্নান করতে পারলে মানবজীবন সফল ।

লেখক :
প্রভাষক (আরবি), আল আমিন বারীয়া কামিল মডেল মাদরাসা
বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

ভিক্ষাবৃত্তি অপনোদনে 'ফানা আনিল খাল্ক' এর বাস্তব প্রয়োগ

✍ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

মানব সভ্যতায় জীবিকা অর্জনের আদিম ও অলস পদ্ধতি ভিক্ষাবৃত্তি; যা চরম ঘৃণিত একটি পেশা; যা অপনোদন করা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ কর্তৃক প্রবর্তিত 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি'র একটি তথা 'ফানা আনিল খাল্ক' এর অনন্য উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে হযরত কেবলা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ বলেন, 'নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইয়ো না।'[১] কেননা, মানুষ নিজের মেধা, শ্রম, ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাকে ইসলাম কখনও প্রশ্রয় দেয় না। বরং তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

অর্থাৎ অন্যান্য ফরয কাজ আদায়ের সাথে হালাল জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একটি ফরয।[২] নবি-রাসুলগণের প্রত্যেকেই আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা দ্বীনি দাওয়াত প্রদান, মানুষদের সৎ পথের সন্ধান দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন পেশা ও কর্মসংস্থানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং আপন উম্মতদের তা শিক্ষা দিয়েছেন।[৩] মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ

كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾

১ - শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী, উছুলে ছাবয়া (স্মারক গ্রন্থ), পৃ : ২১১
২ - শু'আবুল ঈমান, হাদিস : ৮৩৬৭; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হাদিস : ১১৬৯৫; মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ২৭৮১
৩- সহিহ বুখারি; মিশকাতুল মাসাবিহ,পৃ : ২৫৮

অর্থাৎ 'যমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব একমাত্র (আমি) আল্লাহ্‌রই ওপরে।'[৪] এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তি (জীবনে) সফলতা লাভ করেছে, যে ইসলাম কবুল করেছে এবং তাকে যে পরিমাণ রিযিক তথা সম্পদ দেওয়া হয়েছে তার ওপরেই সে পরিতৃপ্ত হয়েছে।'[৫] অন্যত্র ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে হালাল কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং ভিক্ষা করা। আর এ কাজে ইসলামি লেবাসকে ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে ভিক্ষুকরা অপমান করে যাচ্ছে ইসলামকে; অথচ ইসলাম এটিকে শর্তসাপেক্ষে নিন্দনীয় বৈধ করেছে; মূলত তা অধিকার নয় বরং সুযোগমাত্র। সামাজিকভাবেও ভিক্ষা নিচু একটি পেশা। কিছু মানুষ আছে, যারা শারীরিকভাবে সক্ষম ও শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিজেদের জীবন নির্বাহের প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে, যা একেবারেই লাঞ্ছনাকর। ইরশাদ হচ্ছে, শক্ত-সমর্থ ও দৈহিক সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করা হালাল নয়।[৬] অনুরূপভাবে, মিথ্যা আবশ্যকতা দেখিয়ে অথবা কৃত্রিম বিকৃত রূপ ধারণপূর্বক অন্যের সহানুভূতি ও দাক্ষিণ্য প্রত্যাশা করাও এক প্রকারের ধোঁকা, যা স্পষ্ট হারাম। তাই এ পেশাকে নিরুৎসাহিত করে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করার ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচঞা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করা- (এ কাজটি) মানুষের নিকট ভিক্ষাবৃত্তি করার চেয়ে অনেক উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।'[৭] তবে একান্ত অপারগ অবস্থায়

---

৪ - সূরা হুদ : আয়াত-০৬
৫ - সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩১৬
৬ - জামে তিরমিযি; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২৯৪
৭ - সহিহ বুখারিঃ, হাদিস : ১৪৭১

ভিক্ষার অবকাশ দেওয়া হলেও তা পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে এক আনসারি সাহাবি ভিক্ষা চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কিছু আছে কি? তিনি বললেন, একটি কম্বল আছে যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। একটি পাত্র আছে পানি পান করি। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। ঐ সাহাবি তা নিয়ে এলে, হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে নিয়ে বলেন, এ দুটি বস্তু কে কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এগুলো এক দিরহামে নেব। তিনি দুইবার অথবা তিনবার বললেন, কেউ এর অধিক মূল্য দেবে কি? আরেকজন বলল, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি ওই ব্যক্তিকে তা প্রদান করে ঐ আনসারি সাহাবিকে বলেন, এক দিরহামে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও। আরেক দিরহামে কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। সাহাবি তা-ই করলেন। হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে হাতল লাগিয়ে বললেন, যাও, কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। পনেরো দিন যেন তোমাকে না দেখি। ঐ সাহাবী কাট কেটে বিক্রি করতে লাগল। অতঃপর সে এল, তার কাছে দশ দিরহাম ছিল। সে এর থেকে কিছু দিয়ে কাপড় ও খাবার কিনল। হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম।'[৮] আর ভিক্ষাবৃত্তিকে যারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কর্ম করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন তাদের জন্য হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে অন্যের কাছে কিছু চাইবে না, তা হলে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব।'[৯]

ইসলাম এই ভিক্ষাবৃত্তিকে দাফন করতে অসহায় বিপন্ন মানুষকে সচ্চল করতে ধনীদের উপর দান-সদকা ও যাকাত আবশ্যক করেছে। মূলত ধনী-গরিব ৩ ধরনের। প্রথমত, যার কাছে নেসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদ

৮ - জামে তিরমিযি, হাদিস : ১২১৮
৯ - সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৪৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৫৮৮

রয়েছে। তার ওপর যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আর তার জন্য সাদকা খাওয়া নাজায়েজ। দ্বিতীয়ত, যে বর্ধনশীল নয় এমন সম্পদের নেসাব পরিমাণ মালিক। তার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়; কিন্তু সাদকায়ে ফিতর ও কোরবানি ওয়াজিব। তার জন্যও সদকা খাওয়া নাজায়েজ। তৃতীয়ত, যে বর্ধনশীল-অবর্ধনশীল কোনোটার নেসাবের মালিক নয়, কিন্তু তার প্রয়োজন অনুযায়ী মাল আছে। তা হলে সে যাকাতও খেতে পারবে, সাদকাও খেতে পারবে। উপর্যুক্ত তিন প্রকারের কারও জন্য ভিক্ষা করা জায়েজ নেই। তবে হ্যাঁ, যার কাছে একদিন চলার মতো খাদ্য সংরক্ষিত নেই, তার জন্য ভিক্ষা করা জায়েজ আছে। প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবু বিশর কাবিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকটে গিয়ে এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি বলেন, অপেক্ষা করো। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন,

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا-

অর্থাৎ : 'হে কাবিসা! তিন ধরনের ব্যক্তি ছাড়া আর কারও জন্য (অন্যের নিকট) হাত পাতা, তথা ভিক্ষা করা বৈধ নয়। যথা : ১. যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে; কিন্তু তারপর তাকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে। ২. যে ব্যক্তি কোনো কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; সেও তার প্রয়োজন মিটানোর উপযোগী সম্পদ চাইতে পারে। ৩. যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ কিংবা অভাব-অনটনের খপ্পরে পড়েছে; এ ব্যাপারে তার বংশের অন্তত তিন জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করেছে যে, অমুকের উপর অভাব-অনটন চেপে বসেছে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষেও প্রয়োজন মিটানো পরিমাণ সম্পদ প্রার্থনা করা বৈধ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'হে কাবিসা! শুনে রাখো' এই তিন

ধরনের ব্যক্তি ছাড়া আর কারও পক্ষে অন্যের নিকট হাত পাতা হারাম। যারা এভাবে হাত পাতে আসলে তারা হারাম খায়।'[১০]

যদি আমরা বর্তমানের ভিক্ষুকদের প্রতি লক্ষ করি তা হলো দেখতে পাব যে, তাদের অধিকাংশই ভিক্ষা করে মাল বৃদ্ধির জন্য। খাদ্যসংকটে পতিত হয়ে প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়; অথচ এ সম্পর্কে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে ইরশাদ করেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য লোকজনের কাছে মাল প্রার্থনা করে, নিশ্চয় সে যেন আগুনের অঙ্গার প্রার্থনা করল। কম প্রার্থনা করুক বা বেশি প্রার্থনা করুক।[১১] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোনো গোশত থাকবে না।'[১২] অথচ অসাধু সিন্ডিকেটরা ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তারা অবুঝ শিশু ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কাজে লাগিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা; এমনকি সুস্থ মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিবন্ধিত্বের কবলে ফেলে এ বাণিজ্য করছে। নবজাতক শিশু থেকে শুরু করে চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধদেরও ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার করছে তারা। শুধু বেঁচে থাকা বা পেটের দায়ে নয়; ভিক্ষা করে বা ভিক্ষুকদের সিন্ডিকেট করে বাড়ি-গাড়ি করার অবাক করা খবরও প্রকাশিত হয়েছে মিডিয়াতে। এ টাকায় তাদের নিরাপত্তা ও ভিক্ষা করার জায়গার নিশ্চয়তা মেলে। ক্ষেত্রবিশেষে ভিক্ষার পয়েন্ট সুরক্ষিত রাখতে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, কাউকে কাউকে স্থানীয় সন্ত্রাসীদেরও কিছু টাকা দিতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, ভিক্ষুক সিন্ডিকেটের লোকেরা শিশুদের অপহরণ করে অঙ্গহানির মতো ঘটনা ঘটিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়ে থাকে। তাদের সৃষ্ট অসংখ্য লোমহর্ষক ঘটনা রয়েছে। যার বর্ণনায় গা শিউরে ওঠে। যদিও ভিক্ষাদান সম্পূর্ণ ব্যক্তির ইচ্ছা স্বাধীন; কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির বর্তমান দৃশ্য পর্যালোচনা

---

১০ - সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২৯৪
১১ - সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২৮৯;সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৫৮৯
১২ - সহিহ বুখারী, হাদিস : ১৪৭৪

করলে দেখা যায়, কিছু কিছু ভিক্ষুক জোরপূর্বক ও নানা ধরনের বিরক্তিকর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে টাকা আদায় করে নিচ্ছে। রাস্তায় ট্র্যাফিক সিগন্যাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিটি পয়েন্টে গাড়ির উপর হামলে পড়ে এসব ভিক্ষুকের দল। বাচ্চা কোলে নিয়ে শিশু ও মহিলা, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু, অসুস্থতাসহ যে যেভাবে পারছে সেভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করছে সাহায্যের জন্য। এ ভিক্ষুকদের নানারকম উৎপাত ও বিরক্তিকর আচরণে ক্ষুব্ধ অনেকেই। এক্ষেত্রে সমাজ বিশ্লেষকদের অভিমত হলো, মনুষ্য সত্ত্বার মর্যাদাবোধের জাগ্রতকরণই পারে এমন অপমানজনক কাজ থেকে মানুষকে বাঁচাতে। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যারা ভিক্ষা করে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃত ভিক্ষুকদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সরকার ও জনপ্রশাসনের দায়িত্ব। সরকার ভিক্ষুকদের জন্য যে পুনর্বাসন এবং আর্থসামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, ভুয়া ভিক্ষুকদের শনাক্ত করাসহ নেপথ্যে থাকা অবৈধ চক্র ও সিন্ডিকেটের সব সক্রিয় কর্মীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, প্রকৃত দরিদ্রদের তালিকা প্রণয়ন করা এবং তাদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে বাজেটে এদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সময়ের দাবি। সর্বোপরি ভিক্ষাবৃত্তিকে সঠিক জায়গায় আনতে সরকার এবং নগর প্রশাসন যদি এখনই সোচ্চার না হয়, তা হলে ভবিষ্যতে সামাজিক অবক্ষয়ের আরও বিরূপ প্রভাব দেখা দেবে। আর আমরা যারা সত্যিকার অর্থে অসহায়দের সাহায্য করতে চাই, তারা এই সংকটময় পরিস্থিতি না কাটা পর্যন্ত কষ্ট করে হলেও ভিক্ষুককে আর্থিক সাহায্য না করে তাদের খাবার, শীতের কাপড় কিংবা তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিজেরা কিনে দেবো। তা হলে খুব স্বল্প হলেও এই পেশায় পরিবর্তন আসবে। বস্তুত, যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন এবং অভাব লোকের সামনে পেশ করবে, তার প্রয়োজন এবং অভাব কোনো দিন পূরণ হবে না। তাই সে সব সময় লোকের কাছে যাচনা করতেই থাকবে এবং তার পেট পূরণ হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখবে এবং তাঁর উপর ভরসা করে জীবিকার্জনে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তার অভাব দূর হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

অর্থাৎ তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন। আর যে ব্যক্তি সঠিক পন্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে, তার সাফল্য ও কার্যসিদ্ধি বা অভিষ্টলাভের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।[১৩] আর এক্ষেত্রে শরয়ি ফায়সালা হলো যদি কোনো ব্যক্তি আয়ের সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বনের পরও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অত্যাবশ্যক নূন্যতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম না হয়, তবে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সরকারি উদ্যোগে ওই ব্যক্তির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যদি তাতে সম্ভবপর না হয়, তা হলে সামাজের বিত্তবান, ধনাঢ্য লোকদের দায়িত্ব হলো ওই অক্ষম ব্যক্তির বেঁচে থাকার উপায় অবলম্বন করে দেওয়া। অতএব আসুন, আমরা ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হই এবং তাদেরকে কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী করার প্রতি উৎসাহ দেই। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের কথা তাদের কাছে পৌঁছে দিই। যাতে সমাজ ও দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য অভিশাপ দূর করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রকৃত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাবলম্বি করে তোলার মানবিক মহান দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। আমিন বিহুমাতি সৈয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখক :
আরবি প্রভাষক, তাজুশ শরীয়াহ দরসে নেজামী মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
খতিব, রাজানগর রাণীরহাট ডিগ্রি কলেজ জামে মসজিদ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
পরিচালক, গাউসুল আজম রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।
E-mail : masum.jasa.ctg@gmail.com

১৩ - সূরা তালাক, আয়াত:৩

The Significance of Reducing Wastage of (Time, Food, and Resources) Through '*Fana Anil Hawa*'

Rabiul Hossain[1] ***Suborno Barua[2]***

According to the **waste index report**[1] released on March 4th by the United Nations Environment Programme, households in Bangladesh squander 10.62 million tonnes of food annually.[1] The report says that an average Bangladeshi wastes 65 kg of food annually; on the other hand, Somalia is on the verge of a famine. Children are dying of hunger. On the other side of the world we are submerged in wasting our food, our time as well as our natural resources. *Usul-a-Sa'ba* is the seven principles which includes *Fana Anil Hawa* or the annihilation of unwanted activities. Following the principle can surely be useful.

A third of all food produced worldwide is wasted, and the production, transportation, and rotting of that food results in the release of 8–10% of all greenhouse gases in the atmosphere.[2] According to the UN Food and Agriculture Organization, if food waste were a nation, it would have the third-largest carbon footprint, behind the United States and China. Alongside food we are ahead at wasting water and our natural resources. The rivers around megacities like Dhaka and Chattogram are polluted. The underwater freshwater resources are also drying up. Only 2.5% of the water that covers the entire surface of the world may be classified as freshwater. (Shiklomanov, 1993)[3] Two-thirds of the world's population experience water scarcity

at least once a year, and 1.6 billion people currently experience an economic water deficit. (FAO, 2007, Mekonnen and Hoekstra, 2016)[4] It will get worse when it comes to water stress and scarcity. By 2025, about 1.8 billion people living in various parts of the world may experience complete water scarcity.[5] The world uses social media; platforms for more than 10 billion hours per day, which is roughly 1.2 million years of human life.[6] According to Global Social Media statistics 35.4% use social media for filling spare time, 20.5% for avoiding missing out on things and 20.9% for following celebrities or influencers. The world spends more than **10 billion hours** using social platforms each day, which is the equivalent of nearly **1.2 million years** of human existence. The purpose is not to devaluate the usefulness of social media rather it is a comparison of the time invested on positive outcomes. Then comes the adversity of wasting our natural resources. Coal and oil are the energy generators around the world but if we try to understand their uses in our life, we would find ourselves wasting half of the energy produced by the two. These carbon emitters are major contributors of global warming. Global warming is mostly caused by emissions from fossil fuels, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 89% of the world's CO_2 emissions in 2018 came from industry and fossil fuels.[7] The object is clear to us now, humans waste their time, food and the non-renewable resources more than they used to. Today the earth is a home to 8 Billion people. The numbers are going to rise as well as the problems from over-consumption, abundant food waste and shortage of energy sources. The solution lies here in *Usul-a-Saba*. From the seven principles originated by Gawthal Azam Maizbhandari Hazrat Syed Ahmad Ullah (Q.) *Fana Anil Hawa* is one of them. “It is to restrict oneself from unnecessary actions and vain talks. As a result, it will ease

the life and make it trouble free" asserted by Syed Delowar Hossain Maizbhandari.[8] If we elaborate the saying of the Sufist, we come to understand the solution it shows us. Unnecessary actions like wasting food, wasting time and wasting our natural resources which we can easily avoid in this 21st century but we are not avoiding them. Our ignorance to accept the truth that wasting has a negative effect on our life and our society brings unwanted hassles and problems. As a result, our lives become complex and problematic. Instead, if we try to decrease our time in unproductive works and stop wasting our foods, the Almighty Allah surely will help us. As in Surah Ankabut, (verse 69), "And those who strove in Our way - We shall surely show them Our paths; and indeed Allah is with the virtuous." According to Stephen R. Covey, an American scholar and the author of the best-selling book "7 Habits of Highly Effective People", you must accept that it's good to say no to some things in order to lead a more balanced life. There's no need to take on too much. Realizing when it is appropriate to say "no" is all that is required, after which you should concentrate on your top priorities. There is a limit to everything. Surah al Qasas, (verse: 50) "Therefore, if they don't respond to you, just know that they are acting to satisfy their own desires. Who else might lead people astray more than those who give in to their appetites without seeking Allah's guidance? Undoubtedly, Allah does not lead the wicked." The overstepping of the limit always disturbs the balance of the existence of life. That's why Gawthal Azam Maizbhandari Hazrat Syed Ahmad Ullah (Q.) many times while with his murids he used to advise them, "Eat like the pigeons, but do not eat haram, and while eating with your children praise the Almighty."[8] (*Wiltat-e-Mutlaqa*, pg-102).

Eat like the pigeons mean to eat without wasting a piece of food like the birds who never leave behind any piece of grain. Eat halal or do not eat haram refers to eating within limits. As per Surah Al Baqarah, “O ye who believe! Eat of the good things wherewith We have provided you, and render thanks to Allah if it is (indeed) He whom ye worship” (2:172). As Haram includes wasting of time and food. We must bear in mind the obligation of restricting ourselves from wasting food and time. To attain the path of spiritual bliss and achieve perfected humanity we must change our habits. In Surah al-Mumi'nun (verse:23), "The believers have indeed attained true success; those who, in their Prayers, humble themselves, who avoid whatever is vain and frivolous;" Indeed, the Japanese adjective "もったいない" or "mottainai" expresses how regrettable it is for something to be wasted. It conveys a sense of remorse, guilt, or sadness about the act of waste. In Japan, the sentiment associated with the phrase permeates both culture and thought patterns.[9] Even the great Sufist and poet Jalal Uddin Muhammad Rumi wrote about the importance of time. In this materialistic world we make up ourselves with ornaments and precious stones, we spend millions on making ourselves look gorgeous and wealthy only to showcase others that we are leading an our luxurious life. This is also a waste of wealth, and time. Here is where poet Rumi says, "Half of life is lost in charming others/The other half is lost in going through anxieties caused by others/Leave this play/You have played enough."[10] The significance of saving time, wealth and resources for better good has been spoken by every intellectual man on earth. Even the enlightened one, Gautam Buddha has said, “It is only when you maintain spartan habits with regard to food and head, will you become a good natured individual.” In order to be a good natured individual the sense of eradicating food waste, time waste and unnecessary activities is compulsory. The

principle *Fana Anil Hawa* is thus very essential for human beings. Moreover, when ths world is talking abour sustainability we must follow *Fana Anil Hawa* or annihilation of unwanted hassles. This principle is also beneficial for students and workers who suffer of ill time management. We try many tricks and tips but eventually fail. Following *Fana Anil Hawa* can solve the problem.

An average person lives 78 years. We spend 28.3 years of our life sleeping. If we take out the 28 years, we are left with mere 50 years where 20/25 years pass gaining maturity. The time passes away as it is said, "Time and Tide wait for none." Scarcity of food is going to rise in future because of climate change. Unwanted drought, floods and typhoons will emerge destroying crops, lives and resources. So, the annihilation is a must. We can surely succeed in living a hassle-free life by following *Usul-a-Sa'ba* or specifically *Fana Anil Hawa.* As in response to the question"What is the largest mistake we make in life?". The Buddha said, "The biggest mistake is you think you have time," Although time is free, it is invaluable. Although you cannot own it, you may utilize it. Although you cannot retain it, you may spend it. And, the decision is upon you how you spend it.

References:

1. https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
2. https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/news/2021/sep/04/how-food-waste-is-huge-contributor-to-climate-change
3. Shiklomanov I. World fresh water resources. In: Gleick P.H., editor. Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources. Oxford University Press; New York: 1993.
4. Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y. Four billion people facing severe water scarcity. Sci. Adv. 2016;2

5. WWAP. UNESCO; Paris: 2012. The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk.
6. https://datareportal.com/social-media-users
7. https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/fossil-fuels-and-climate-change-the-facts/
8. Syed Delowar Hossain (R.) *Wilatat-e-Mutlaqa* Gausia Ahmadia Manjil, Maizbhandari Darbar Sharif, Chittagong, 3rd edition, Chittagong, 1974.
9. https://www.tofugu.com/japanese/mottainai/
10. Williams, A. (2020). The Masnavi of Jalaloddin Rumi Vol. 1: A New English Translation with Persian Text and Explanatory Notes. (1 ed.) I.B. Tauris.

Author :
[1]Lecturer, Department of English
Nanupur Laila Kabir Degree College
Fatikchhari, Chattogram.
& Research Fellow, Darul Irfan Research Institute (DIRI)
[2]Student, Department of English Language and Literature
International Islamic University Chittagong (IIUC)

ফানা আনিল হাওয়া : কুপ্রবৃত্তির বর্জন ও খোদাতুষ্টি অর্জন

✍ মুহাম্মদ আবুল হাছান

প্রেম বিনে ফানা
মানব মনে যায় না আনা ॥

সম্মানিত নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম) অহি-র জ্ঞানলাভে মানুষকে খোদার পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরা এ কাজটি গুরুত্বের সহিত পালন করেছেন। আল্লাহ্‌র অলিগণ নবিদের উত্তরাধিকারী ও তাঁদের গুণে গুণান্বিত বিধায় তারাও ইলহামি জ্ঞানে মানুষকে খোদার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়ে দেন।

সাধারণত মানুষ নিজেকে সফল দেখতে চাইলেও অন্যের সফলতায় তেমন আগ্রহী নয়; কিন্তু নবি-অলিগণ মানবজাতিকে নির্বিশেষে সফলতার পথে আহবান জানান। কারণ, নবি ও অলিরা মানবজাতি ও সৃষ্টিজগতের বন্ধু। আর প্রকৃত বন্ধুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কল্যাণকামিতা। এ ধারাবাহিকতায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মানবজাতির মুক্তির সনদ হিসেবে “উছুলে ছাবয়া” প্রবর্তন করে তরিকতপন্থিদের জন্য খোদা প্রাপ্তির পথ সহজ করে দিয়েছেন।

‘উছুলে ছাবয়া’য় প্রথম তিনটি ফানা (فَنَاء) বিষয়ক। বাকি চারটি মউত (موت) বিষয়ক। এ যেন মৃত্যুর আগে ফানা তথা বিলীন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। প্রাণী হিসেবে প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু ফানা (فَنَاء) সবাই হতে পারে না। ফানা-র গুণ অর্জন করতে প্রেম আবশ্যক। প্রেম ছাড়া কেউ ফানা (فَنَاء) বিলীন হতে পারবে না। স্রষ্টাকে পেতে হলে যাবতীয় মোহ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিলীন হতে হবে। সর্বসাধারণের জন্য স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ‘গাউছিয়তের সপ্তকর্ম পদ্ধতি’র ‘ফানা

আনিল হাওয়া' (فنَاء عن الهواء) বা 'প্রবৃত্তির বিনাশ' অন্যতম কর্মপন্থা। এ পদ্ধতি মানুষকে অহেতুক কথা ও কাজ থেকে বিরত রেখে খোদার স্মরণে ধাবিত করে।

মহান আল্লাহ মানুষকে তার স্মরণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ

অর্থ: তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো (সূরা বাকারা : আয়াত ১৫২)।

মানুষের সার্বক্ষণিক চিন্তাশক্তি ব্যয় হবে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সন্তুষ্টির তরে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মানব মনে স্থান পেলে তাঁর স্মরণবিচ্যুত হয়; এমন অহেতুক কথাবার্তা, কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। চিরস্থায়ী আল্লাহ্‌র স্মরণ যে গুণের মাধ্যমে সহজে অর্জন হয়, মাইজভাণ্ডারী তরিকানুযায়ী সে গুণটি হলো 'ফানা আনিল হাওয়া' (فنَاء عن الهواء) যা অপ্রয়োজনীয় চাহিদা দূর করে। আর মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র স্মরণ অর্জিত হওয়া মোটেও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা নয়, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি চাহিদা। ফানা আনিল হাওয়া (فنَاء عن الهواء) গুণটি অর্জন হলে অপ্রয়োজনীয় চাহিদা দূর হবে; অপর দিকে বান্দা হিসেবে একান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা আল্লাহ্‌র স্মরণ অর্জন হবে। প্রকৃত মুমিন আল্লাহ্‌র স্মরণ ব্যতীত একমুহূর্ত বাঁচতে পারে না। পবিত্র হাদিসে আল্লাহ্‌র স্মরণকারী ব্যক্তিকে জীবিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لَايَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

হযরত নবিজি সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে, আর যে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো, জীবিত ও মৃত লোকের অনুরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্মরণ করে সে জীবিত ব্যক্তির ন্যায়। এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না; সে মৃত ব্যক্তির ন্যায়। (বুখারি, ১০ম খণ্ড)

জীবনযাত্রা সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্য অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে সময়ের অপচয় রোধ করা যায়। প্রয়োজনহীন কথা ও কাজ করা মানে সময়ের অপচয় করা। কারণ, কথা ও কাজ দু'টিই সময়ের অধীন। ইসলামি শরিয়তে বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে অপচয় হিসেবে গণ্য করা হয়। অপচয়কারীকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

অর্থ : তোমরা অপচয় করোনা, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ : ৩১)

অতএব, 'ফানা আনিল হাওয়া' (فنَاء عن الهواء) গুণের অধিকারী ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ হতে বিরত থেকে অপচয়কারী না হয়ে, মুমিনের প্রয়োজনীয় গুণ আল্লাহ্‌র স্মরণকারী বান্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর গুণটি অর্জন করার তৌফীক দান করুন আ-মি-ন।

লেখক :
সহ-সুপার
দক্ষিণ আশিয়া গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা
আশিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিশ্ব মানবতায় 'গাউছিয়ত নীতি'র অবদান

✍ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

পরম করুণাময় দয়াময় প্রভু আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতের মালিক করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন : আপনার পরম্পরা (ছিলছিলাহ্) কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। আপনার আওলাদ বৃদ্ধি পাইবে। আপনার অনুসারী দ্বারা দুনিয়া পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আপনার সুনাম মিম্বরগুলোর উপর সমুন্নত হইবে। কেয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী অলিয়ে কামেল ওলামায়ে কেরাম ও বক্তা আল্লাহ্তায়ালার স্মরণের সাথে আপনার স্মরণ করিতে থাকিবে। (পক্ষান্তরে) অসংখ্য নেয়ামত ও সব ধরনের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে আপনার দুশমনই। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হইতেছে নবিউল্লাহ অলিউল্লাহগণই যেহেতু নবীগণের স্থলাভিষিক্ত হইতেছেন অলিগণ। 'এহেন অবস্থায় ইনছান মানব সত্তা আয়না বা দর্পন সদৃশ্য'। 'আয়না পরিষ্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে সম্মুখের সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়। তদ্রূপ মানব অন্তর পরিষ্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে খোদার গুণ গরিমা, সত্য সত্তা অলক্ষ্যেই আয়ত্ত হইয়া যায়। যেহেতু খোদাতায়ালাই নিত্যসত্য ও বিদ্যমান সত্ত্বা'। (মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার পৃষ্ঠা- ১১) তাই খোদা সন্ধানীদের পথের সন্ধান দিতে 'নফ্ছে ইন্ছানি ও রূহে ইন্ছানির অবস্থা, প্রকৃত মানব বা ইন্ছানে কামেল কে? নিজ পরিচয় ও খোদার পরিচয় এবং আনুগত্যের জন্য ছুন্নতে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতেই পীরি-মুরিদি প্রথা প্রচলিত।' (মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার পৃষ্ঠা-৭) যেহেতু স্রষ্টার স্মরণই মানবের মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বায়াত গ্রহণের সময় স্বীকার করিতে হয় : আমি একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করিলাম। সর্বান্তঃকরণে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই বা উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

তাঁহার অনুগত রাসুল হন এবং স্বীকার ও ওয়াদা করিতে হয়, আমি আমার ধর্মীয় এখতেয়ার বা ইচ্ছা শক্তিতে খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট তাঁহার অনুগামী খলিফা বা প্রতিনিধিগণের মধ্যস্থতায় কাদেরিয়া তরিকাতে ঐ তরিকার যুগ সংস্কারক মোজাদ্দেদ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর প্রদর্শিত মতে অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি।

স্বীকার করিতেছি : আমি শিরক করিব না, চুরি করিব না, আমি হযরত রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাঁহার আছহাব ও খলিফাগণের মধ্যস্থতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি-আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই, নামায কায়েম রাখিব, রমযান মাসে রোযা রাখিব, আল্লাহ্তায়ালা যোগ্যতা দান করিলে যাকাত আদায় করিব, সামর্থ্য হইলে হজ্ব করিব। কলেমায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জিকির হিসেবে গ্রহণ করিলাম।

নফ্ছে ইনসানির কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া রুহে ইনসানির সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তরিকত পন্থার উছুল হিসাবে 'উছুলে ছাবয়া' 'সপ্ত কর্ম পদ্ধতি'কে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। তাহার প্রথম অংশ "ফানায়ে ছালাছা ও রিপুর বিনাশ স্তর" বা আল্লাহ্র সন্তষ্টিতে সন্তষ্ট থাকার অনুশীলন পদ্ধতি ইসলামের শুরু হইতে প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও আছে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে পাকে ফরমাইয়াছেন- "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতি পালকের প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে এবং সন্তোষ ভাজন হইয়া ফিরিয়া যাও।" (সূরা আল ফজর : আয়াত- ২৭-২৮) কাজেই মুসলিম ব্যক্তি নিজের সকল কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা সবকিছুকে আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে পারিলেই মুসলিম দাবি করা যথার্থ হইবে। কিছু আল্লাহ্র ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিলাম আর কিছু নিজ ইচ্ছায় রাখিয়া দিলাম এমনটা হইলে তাহা ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হইলে জীবনের সকল অবস্থায় তাঁর অসন্তুষ্টি পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

যাহার জন্য অকারণ বা বাহুল্য আলাপচারিতা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। এটি মানিয়া চলিতে পারিলে সমাজ জীবনে অযাচিত ঝামেলা কলহ, দ্বন্দ্ব- সংঘাত এড়ানো যায়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইহা অত্যন্ত কার্যকরি সুত্র। তাহা ছাড়া "গিবতের মতো" পাপ হইতেও মুক্ত থাকার জন্য কাহারও নিন্দা- গিবত না করা ও নিজের দোষ

স্বীকার করা অপরের দোষ অনুসন্ধান না করা। গিবত- একটি ভয়ঙ্কর ও জঘন্যতম গুনাহ-র কাজ। কাহারও অগোচরে তাহার পোশাক-পরিচ্ছেদ, বংশ, চরিত্র, দেহাকৃতি, কর্ম, দ্বীন, চলাফেরা, ইত্যাদি যেই কোন বিষয়ে কোনো দোষ অপরের কাছে প্রকাশ না করা। (ইহইয়াউল উলুমিদ্দিন, ৩য় খণ্ড : পৃষ্ঠা- ১৪৩)। এই প্রসঙ্গে হজরত হাসান বসরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, পরচর্চায় তিন ধরনের পাপ হইতে পারে। অপরের মধ্যে যেই দোষ বিদ্যমান, তাহা আলোচনা করা গিবত; যেই ত্রুটি তাহার মধ্যে নাই তাহা আলোচনা করা অপবাদ; আর তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শ্রুতি তাহা আলোচনা করা মিথ্যা বলার সামিল (ইহইয়াউল উলুমিদ্দীন ৩য় খণ্ড : পৃ-১৪৪) এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামিন ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্‌র হিদায়তের পরিবর্তে যেই ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাঁহার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (সূরা আল কাসাস : আয়াত- ৫০) হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "জেনে রাখো, যেই ব্যক্তি পবিত্র হইতে চায় আল্লাহ্ তাহাকে পবিত্র রাখেন, যেই ব্যক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে চায় না আল্লাহ্ তাহাকে স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলেন। যেই ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করিতে চায় আল্লাহ্ তাহাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন। ধৈর্যের চাইতে উত্তম প্রশস্ত আর কোনে জিনিস কাউকে দেওয়া হয়নি।" (মসনদে আহমদ : হাদিছ- ১১৪৫৬)।

দোষের জন্য অনুতাপ করা এবং নির্দোষ জনিত খোদাতায়ালার অনুগ্রহ উন্মুক্ত বিনয়। যেমন : (ফানা আনিল হা'ওয়া) হা'ওয়া শব্দের অর্থ হইলো প্রেম, ভালোবাসা, ভালোবাসার বস্তু, আবেগ, অনুরাগ, ঝোঁক, পছন্দ, ইচ্ছা, কামনা, প্রবৃত্তি, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, খেয়াল, কল্পনা। সুতরাং, "ফানা আনিল হাওয়া" হইলো পার্থিব আবেগ-অনুরাগ, প্রবৃত্তি ও কল্পনা হইতে বাঁচিয়া থাকা। অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে এমন কাজ কর্ম, কথা-বার্তা ও অপ্রয়োজনীয় কার্যাদি হইতে নিজেকে বিরত রাখা। মানবজাতির উন্নতি সাধনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হইলো তাহার মনস্তাত্ত্বিক, চেতনামূলক ও আধ্যাত্মিক দিক। কারণ মানবজাতিকে তিন প্রকার জিনিস/ বস্তু ধ্বংস করেন, যেমন পবিত্র হাদিস শরিফে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- "ধ্বংসকারী জিনিসগুলার অন্যতম হইলো, (ক) প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া (খ) লোভ-

লালসার অনুগত হওয়া (গ) কোনো ব্যক্তি/ মানুষ নিজেকে বড়ো বা সম্মানিত মনে করা। তবে এই স্বভাবটি সবচাইতে মারাত্মক (মেশকাত শরিফ) রাগ ও অহংকার অধ্যায় ও শুয়াবুল ইমানকৃত হজরত ইমাম বায়হাকি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু হুরায়ইরা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন : এক ব্যক্তি হুজুর পুরনুর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাকে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করুন। প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তুমি রাগ করিওনা।" ঐ ব্যক্তি কয়েকবার একই প্রশ্ন করিতে থাকায় হজরত রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বার বলিয়াছেন : "তুমি রাগ করিয়োনা।" (বোখারি শরিফ)।

পবিত্র হাদিস শরিফের ব্যাখ্যাকারীগণ উক্ত হাদিস শরিফের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর অবস্থা ও চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উত্তর প্রদান করিতেন। যেহেতু প্রশ্নকারী লোকটি কথায় কথায় রাগে-ক্রোধে হিতাহিত ও জ্ঞানহারার মতো হইয়া অনেক কুকর্মের দিকে ধাবিত হইতো। তাই তাহাকে বার বার তিনি একই উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে ঐ অভ্যাস হইতে ফিরিয়া আসে (মেরকাত, শরহে মেশকাত)।

এই জন্য ইসলামি ফিক্হ তথা ইসলামি শরিয়ত অতিরিক্ত রাগ, ক্রোধ, অহংকার, আমিত্ব, সন্ত্রাস, জুলুম, অত্যাচার, ব্যভিচার, হামবড়াই, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, লোভ-লালসা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, মারামারি, খুনা-খুনি, হানাহানি ও অন্যায় আচরণসহ যাবতীয় ফিস্ক/ নাফরমানিকে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এই বিষয়ে পবিত্র কোরআন, হাদিস, এজমা, কেয়াছের আদলে সাজ্জাদানশিনে গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর প্রকাশিত হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থে লিখিয়াছেন- (ক) একদা এক ব্যক্তি, হযরতের খেদমতে নালিশ করিল যে, তাহার ভ্রাতা জুলুম করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। হযরত তাহাকে তাহার ভ্রাতার সহিত আপস মীমাংসা করিয়া লওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। লোকটি তখন বলিল যে, তাহার ভাই আপস মানে না। হযরত আবার বলিলেন, সে হারামজাদা, তাহাকে কিছু বেশি দিয়া আপস কর।

এইরূপ ঘটনাতে প্রায় লোককে তিনি আপস মীমাংসার আদেশ দিতেন। (খ) বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ শাদিতে অতি উৎসব ও আমোদের বশবর্তী মানবের অতিব্যয় তিনি (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী) পছন্দ করিতেন না। তাই গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হজরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর খেদমতে কেহ শাদি শব্দে বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন; বরং তাঁহার নিকট "ইজাব-কবুল" বিবাহ বন্ধনে সুন্নতি উপায়ে বিবাহ কার্য নির্বাহের অনুমতি পাইতেন। সাধারণ ভাবে সংসার যাপনে খাদেমা ও সেবিকা নিযুক্ত করিতে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "অনাবশ্যক" কার্যে লিপ্ত সংসার নির্বাহ নিশ্চয় নবি বর্ণিত "দারুল হোজন" অর্থাৎ চিন্তাগার ও দুঃখ খনি এবং দুনিয়াদারি। আবশ্যকীয় সম্ভব স্বপ্লব্যয়ে জীবিকা নির্বাহ নিশ্চয় দিনদারি। শান্তিময় জীবন যাপন ও নির্বিলাস সভ্যতা খোদা পন্থের সহায়ক। মাকাসিদে শরিয়া- এর অনুধাবন ও বাস্তবায়নে মানুষ আগ্রহী হয় এটাই তাসাউফ দর্শনের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং মানুষকে ইসলামি শরিয়তের পাবন্দ বানায়।

আমরা যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত সঠিক পথে থাকিতে চাই, তাহা হইলে-পবিত্র কুরআন, হাদিস, এজমা ও কেয়াছের আদলে সমস্ত নবি-রাসুল, আহলে বায়াতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাক পাঞ্জতন, খোলাফায়ে রাশেদিন, আশরা-এ মুবাশশ্রা, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন, তবে তাবেইন, আইম্মা-এ মুজ্তাহেদিন, সমস্ত হক তরিকতের ইমাম আউলিয়ায়ে কামেলিন ও নেককার সালেহিনের পথ অনুসরণ অনুকরণ করে নফ্সে ইনসানিকে রূহে ইনসানিতে পরিণত করার জন্য গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হজরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি'কে মুক্তির দিশারি মানবতার উন্নয়নকারী হিসাবে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং, তাহার অংশ বিশেষ-'ফানায়ে ছালাছা' বা 'গাউছিয়ত নীতি'র উপর আমল করে দ্বীন দুনিয়া দোজাহানের কামিয়াবি হাছেল করার তৌফিক আতা করুন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। আ-মি-ন ॥

লেখক :

দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ

প্রকৃত মু'মিনের পরিচায়ক 'গাউছিয়ত নীতি'

✍ হাফেজ মুহাম্মদ আবু মুছা

শিরোনামে উল্লেখিত বিষয়ের "প্রকৃত মু'মিন" ও "গাউছিয়ত নীতি" একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষ করে 'গাউছিয়ত নীতি'র সাথে প্রকৃত মু'মিন। কেননা 'গাউছিয়ত নীতি' বিবর্জিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কখনও প্রকৃত মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রতিটি উসুল কুরআন-সুন্নাহর নির্যাস থেকে সংগৃহীত। উক্ত কথার সপক্ষে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর দলিল পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গাউছিয়ত নীতি : বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক প্রাণ কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ, বাংলার জমিনে মাইজভাণ্ডারী তরীকার মহান প্রবর্তক, আহলে বাইতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), খাতেমুল অলদ হুজুর গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি **সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী** (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর নীতি আদর্শ। অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর রচিত 'মানব সভ্যতা' গ্রন্থে 'গাউছিয়ত নীতি' শিরোনামে। যাকে 'ফানায়ে ছালাছা' বলা হয়।

আহলে বাইতে রাসুলগণ হলেন জীবন্ত কুরআন, কুরআন-সুন্নাহর বাস্তব প্রতিফলিত রূপ হলো আহলে বাইতের অনুপম নুরাণি জীবনাদর্শ। হুজুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ছিলেন আওলাদে রাসুল, আহলে বাইতে রাসুল, আধ্যাত্মিক জগতের মুকুটধারী বাদশাহ এবং কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের অতল গভীর জ্ঞানের মহাসাগর। তিনি ইলমে শরিয়ত ও তরিকতের গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

এমন যুগশ্রেষ্ঠ বিশ্ববরণ্য মহা মনীষী হযরত গাউছুল আজম এর নীতি আদর্শ তথা 'গাউছিয়ত নীতি' সাধারণ মানুষকে 'প্রকৃত মু'মিন' বা 'মু'মিনে কামেল'এ রূপান্তরিত হতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে।

মু'মিন : প্রবন্ধের শিরোনামে উল্লেখিত অপর শব্দটি হলো 'মু'মিন'। এটি পবিত্র কুরআন মাজিদে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ।

মু'মিন এর শাব্দিক অর্থ হলো নিরাপত্তা বিধানকারী, আমানতদার, বিশ্বাস স্থাপনকারী ইত্যাদি।

মু'মিনগণ হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র; যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

অর্থ : "আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু।"(সূরা-আলে ইমরান : আয়াত- ৬৮)

মু'মিনদের কারণে গুনাহগারদের উপর আযাব আসা বন্ধ হয়ে যায়। কুরআন মাজিদের বাণী :

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾

অর্থ : "সুতরাং এ নগরীতে যারা মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে আগে বের করে নিয়েছি।" (সূরা-জারিয়াত : আয়াত-৩৫)

ব্যাখ্যা : হযরত লুত (আলাইহিস সালাম) এর উপর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নগরী থেকে আগে বের করে নিয়েছিলেন; এরপর নগরীতে যারা অবিশ্বাসী ছিল তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব এসেছিল। অনুরূপ যেখানে আল্লাহ্র মকবুল বান্দার মাজার থাকে সেখানেও আল্লাহ্র কঠিন কোনো আযাব আসে না। যেমন মিশরে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) মাজার ও তাঁর ভাইদের কবর বিদ্যমান থাকার কারণে ফেরআউন মিশরে থাকা কালীন তার উপর আযাব আসেনি। (নুরুল ইরফান)

মু'মিনগণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত, এবং মু'মিনদের সংশ্রবে যারা থাকবেন তারাও নিরাপত্তা প্রাপ্ত। তাই আল্লাহ তায়ালা সাধারণ বান্দাদেরকে মু'মিনদের সংশ্রবে থাকার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কুরআন মাজিদের বর্ণনা :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (ভালবাসো) এবং সত্যাশ্রয়ীদের (মু'মিনদের) সংশ্রবে থাকো। (সূরা- তাওবাহ : আয়াত- ১১৯)

মু'মিন বান্দাগণ আল্লাহকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ্‌র মু'মিনদের ভালোবাসেন। মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র নিকট যখন যা চান, আল্লাহ তা কবুল করেন। মু'মিনগণ সফলকাম হয়েই দুনিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে পরকালে তাদের কোনো ভয় ভীতি, পেরেশানি ও চিন্তার কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱

অর্থ : "নিশ্চয়ই মু'মিনগণই সফলকাম হয়েছে।" (সূরা-মু'মিনূন : আয়াত-১)

প্রকৃত মু'মিন হওয়ার মর্যাদা অর্জন করা এত সহজ নয়; মু'মিন হওয়ার জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ অনেক ইবাদাত-বন্দেগী, রিয়াজত, মোরাকাবা, মোশাহাদা, জিকির-ফিকির ইত্যাদি কঠোর সাধনা করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষ পার্থিব অতি ব্যস্ততার কারণে পূর্বেকার মানুষের মতো দীর্ঘ সময় নিয়ে নফল ইবাদত বা জিকির আজকার করার মতো অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব সমাজকে রক্ষার মানসে হুজুর গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কে এমন এক খোদায়ি ফর্মুলা দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন, যে ফর্মুলায় শ্রম ও কর্ম অল্প, কিন্তু প্রতিদান পরিপূর্ণ। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর এই খোদায়ি ফর্মুলার নাম হলো "উছুলে ছাবয়া" বা 'সপ্ত মূলনীতি'। এ উছুলে ছাবয়া দু'ভাগে বিভক্ত। (১) "ফানায়ে ছালাছা" বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ। (২) 'মওতে আরবায়া' বা চতুর্বিধ বাসনা মৃত্যু। এ দু' প্রকারের প্রথম প্রকারকে মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচক অছিয়ে গাউছুল আজম, খাদেমুল ফোক্‌রা, হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'গাউছিয়ত নীতি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। মানব জীবনে যদি এ গাউছিয়ত নীতির প্রতিফলন ঘটানো যায়, তা হলে ঐ মানব মু'মিনে কামেল এর স্তরে উন্নীত হবে নিঃসন্দেহে।

"গাউছিয়ত নীতি প্রকৃত মু'মিন এর পরিচায়ক" এটা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংক্ষেপে নিম্নে তোলে ধরা হলো।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মু'মিনের গুণাবলি অর্জনে 'গাউছিয়ত নীতি'র ভূমিকা :

'গাউছিয়ত নীতি' তিন স্তরে বিভক্ত। যথা- (১ম স্তর) তেলাওয়াতে অজুদ। (২য় স্তর) অনর্থ পরিহার। (৩য় স্তর) সন্তোষ।

বিশ্লেষণ :

***(১ম স্তর) তেলাওয়াতে অজুদ* :** তেলাওয়াতে অজুদ হলো নিজ কাজ-কর্মের ভালো-মন্দের বিচার করা। যেমন সারাদিন আপনি কী কী কাজ-কর্ম করেছেন তা রাত্রে ঘুমাবার পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ করা। দিনের কাজ-কর্মে যদি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি মূলক কোনো কাজ-কর্ম পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আগামী কাল ওসব কাজ-কর্ম হতে নিজকে বিরত রাখা। পরদিন আবার যখন তেলাওয়াতে অজুদে বসবেন, তখন দেখবেন যে, গতকালের কৃত মন্দ কাজগুলো আজকে সংঘটিত হয়নি কিন্তু ভিন্ন রকমের ২/১টি মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে গেছে (যদি হয়ে থাকে)। তখন আল্লাহকে বলবেন, হে আল্লাহ! আমি গতকাল সংঘটিত হওয়া মন্দ কাজ করব না বলে তোমার কাছে ওয়াদা করেছিলাম, হে মাবুদ! আমি আমার ওয়াদা রক্ষা করেছি, গতকালের কৃত মন্দ কাজ হতে নিজকে বিরত রেখেছি। কিন্তু আজকে অজান্তে আমার ভিন্ন রকমের ২/১টি কাজ সংঘটিত হয়ে গেছে। হে আল্লাহ! আমার আজকের এ ভুলের জন্যে আমি তওবা করছি, আগামী কাল নিশ্চয় আমি আজকের কৃত ভুল থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ, আমার আজকের ভুলগুলো ক্ষমা করে দাও। আপনি যেহেতু গতকালের কৃত ওয়াদা রক্ষা করেছেন তাই আজকে আপনার তওবা অবশ্যই কবুল করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আগামী কাল যেন আপনার এই নতুন ভাবে সংগঠিত অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে প্রতিদিন অপরাধ কমতে কমতে একদিন দেখতে পাবেন আপনার জীবন থেকে সকল অপরাধ দূর হয়ে গেছে। তেলাওয়াতে অজুদে বসে যখন আপনি আপনার কোনো গুনাহের কাজ দেখতে পাবেন না, তখন আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করে বলবেন, হে আল্লাহ! আমার শক্তিতে নয় বরং তোমার মেহেরবানিতে আমি আজ গুনাহমুক্ত দিন কাটাতে সক্ষম হয়েছি, তাই তোমার প্রতি অফুরন্ত শোকর। এটা বলে আল্লাহ্‌র জন্যে কম পক্ষে দু'রাকাত শোকরিয়ার নামাজ আদায় করবেন। তখন আপনি আল্লাহ্‌র নিকট একজন নিরপরাধ বান্দা হিসেবে গণ্য হয়ে যাবেন। ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি আপনার ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতা

বৃদ্ধি পাবে। মাইজভাণ্ডারী তরীকার গাউছিয়ত নীতিতে এটাকে 'ফানা আনিল খাল্ক'ও বলা হয়।

ফানা আনিল খাল্ক : 'ফানা আনিল খাল্ক' হলো পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার পূর্বক একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। 'ফানা আনিল খাল্ক' প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে ঘোষণা হলো :

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

অর্থ : "মুমিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা।"(সূরা-তাওবাহ, আয়াত-৫১)।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে অন্যত্র বর্ণিত আছে

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা- ত্বালাক : আয়াত-৩)

কুরআন মাজিদের উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে,যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবেন, তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এখানে একটা প্রশ্ন রয়ে যায় যে, আল্লাহ যেহেতু যথেষ্ট তাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো হবে আল্লাহ বাসায় এসে রান্নাবান্না করে খাওয়ায়ে দিয়ে যাবেন। না, 'গাউছিয়ত নীতি' সেটাকে বলে না, 'গাউছিয়ত নীতি' হলো আপনার সামর্থ্য যা আছে তা দিয়ে আপনি চেষ্টা করে যাবেন। আপনি চেষ্টা করে যাবেন আর ফলাফলের জন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইরশাদ হলো

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة -

অর্থ : "অন্যান্য ফরজ কাজের সাথে হালাল রুজি অর্জন করাও ফরজ।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ : হাদিস নং : ২৭৮১)

কুরআন মাজিদের বাণী :

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থ : "জমিনে বিচরণকারী সবার রিজিক আল্লাহ্‌র উপর।" (সূরা : হুদ, আয়াত-৬)।

এভাবে আরও অনেক দলিল দেয়া যায় কিন্তু লিখার কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে বিধায় এ প্রসঙ্গ আর বাড়ালাম না।

তেলাওয়াতে অজুদ এর উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রথমাংশ 'তেলাওয়াতে অজুদ'এর সকল নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহ হতে সংগৃহীত।

(২য় স্তর) অনর্থ পরিহার : অনর্থ পরিহার হলো, যা না হলে চলে ও উপকার বিহীন এহেন কাজ-কর্ম,কথা-বার্তা,পানাহার ও বাগবিতন্ডা এড়িয়ে চলা এবং পরদোষ তালাস পরিহার ও নিজ দোষ ধ্যান করা,নিজ সামর্থ্যে হালাল রুজির প্রতি আস্থাশীল হওয়া, অঙ্গ বিকৃতকারী পোশাক পরিচ্ছদ, ভূষণ ফ্যাশন, কর্ম বিমুখতা ইত্যাদি পরিহার করা। সুফি পরিভাষায় একে **'ফানা আনিল হাওয়া'** বলা হয়। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং অনর্থ পরিহার করার জন্যে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের মধ্যে অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন কুরআন মাজিদের ফরমান :

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ... ﴿٢٧﴾

অর্থ : "তোমরা কিছুতেই অপচয় (অনর্থ) করো না; নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই" (সূরা- বনি ইসরাঈল : আয়াত- ২৬,২৭)।

হাদিস শরিফের মধ্যে রয়েছে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন :

من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه -

অর্থ : "ব্যক্তির সুন্দরতম ইসলাম হলো অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় বর্জন করা।" (বোখারি শরিফ, হাদিস নং ২৫৬)।

যারা মু'মিন তারা অবশ্যই অনর্থ পরিহার করে চলবেন, এটা আল্লাহ তায়ালার ফরমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

অর্থ : "এবং যারা (মু'মিন) তারা অবশ্যই অনর্থ কথা-বার্তা হতে বিরত থাকবে।" (সূরা-মু'মিনুন : আয়াত- ৩)

(৩য় স্তর) সন্তোষ : এটা খোদার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ ইচ্ছা বা কামনা-বাসনাকে নত করে সর্বাবস্থায় খোদার পক্ষ হতে নির্ধারিত ফয়সালাকে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে বরণ করে নেওয়া। ইহাকে **"ফানা আনিল এরাদা"**ও বলা হয়। এ অবস্থায় উন্নীত মানুষের মনে কখনও কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট, অভাব অনটন ও না পাওয়ার বেদনা থাকে না। কেননা তাদের

নিকট অতিরিক্ত কোনো চাহিদা থাকে না, আর চাহিদা না থাকলে অভাবও থাকে না। তারা মনে করে থাকেন তাদের রিজিক, সুখ-দুঃখ, বালা-মুসিবত সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে, আর যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে তা তারা হাসি মুখে শোকরিয়ার সাথে গ্রহণ করে থাকেন, ফলে তাদের থাকে না কোনো দুঃখ-বেদনা কিংবা হারানোর বা না পাওয়ার হাহুতাশ। বান্দা যখন এভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ্‌র তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। হাদিস শরিফের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ যখন কোনো বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল ফিরিশতাকে ডেকে বলেন : আমি জমিনের অমুক বান্দাকে ভালোবাসি তুমি আসমানবাসীদের বলে দাও, তারাও যেন তাকে ভালোবাসে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আসমানবাসীদের নিকট আল্লাহ তায়ালার এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর আসমানবাসী সবাই ঐ মু'মিন বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে দেয়। তারপর আল্লাহ তায়ালা এ সংবাদ জমিনবাসীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এ সংবাদ যখন জমিনবাসীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন তখন জমিনবাসীও ঐ বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে দেয়। এভাবে মু'মিন বান্দাগণ আসমান ও জমিনে সবার প্রিয়ভাজন হয়ে যান। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত এসব মকবুল মু'মিন বান্দাদের শানে আল্লাহ তায়ালার সাদর সম্ভাষণ হলো :

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ۝٢٧ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً ۝٢٨ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي ۝٢٩ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي ۝٣٠

অর্থ : "হে সন্তুষ্ট চিত্ত প্রশান্ত আত্মা! তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, এ অবস্থায় যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও (আল্লাহ) তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার খাস বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো"। (সূরা-আল ফাজর : আয়াত-২৭ হতে ৩০)

এভাবে গুনাহগার বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন করে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্যেই হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'উছুলে ছাবয়া' নামক মুক্তির পয়গাম নিয়ে এবং হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বেলায়তের মুকুট

পরিধান করে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। এ 'উছুলে ছাবয়া'র অংশ বিশেষ হলো 'গাউছিয়ত নীতি'। এই গাউছিয়ত নীতি বক্ষে ধারণ করে অসংখ্য আল্লাহ্‌র বান্দা প্রকৃত মু'মিনে রূপান্তরিত হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মকবুল বান্দাদের দলভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, যা দেশ বিদেশের আপামর জনগণের নিকট দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত।

বর্তমান সময়ে 'গাউছিয়ত নীতি' নামক খোদা পাওয়ার এই ঐশী ফর্মুলার প্রশিক্ষণ (দীক্ষা) দিয়ে যাচ্ছেন, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর রাজ দরবারের বর্তমান সাজ্জাদানশিন, রাজাধিরাজ আওলাদে রাসুল ও আহলে বাইতে রাসুল, পীরে মুকাম্মেল,রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত আলহাজ হযরত মওলানা শাহ সুফি **সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (**মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)। তাই সৃষ্টিকুলের জিন-ইনসান তাঁর নুরানি সোহবত, ফয়েজ ও খেদমতের মাধ্যমে প্রকৃত মু'মিন হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং প্রতিনিয়ত জিন ইনসানের ঢল নামছে তাঁর নুরানি দর্শন, সোহবত ও খেদমতের প্রত্যাশায়। যা সংশ্লিষ্ট সবার জানা আছে।

মাইজভাণ্ডারী নীতি বিধান বা গাউছিয়ত নীতিকে কুরআন-সুন্নাহ হতে এবং কুরআন-সুন্নাহকে মাইজভাণ্ডারী নীতি বিধান বা গাউছিয়ত নীতি হতে পৃথক করার বা বোঝার কোনো অবকাশ নেই। যা উপরে উল্লেখিত দলিল প্রমাণদির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে সকলের নিকট সহজ বোধ্য হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে জগৎগুরু মুক্তিদাতা মুরশিদ কেবলা আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার অনুসরণের মাধ্যমে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফীক দান করো। আ-মি-ন।

লেখক :
প্রতিষ্ঠাতা, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা
শাহারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার।

‘নফ্স’ নিয়ন্ত্রণে ‘ফানা আনিল হাওয়া’র অনুশীলন : একটি পর্যালোচনা

✍ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন

প্রাককথন : মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন, ‘ক্বু আনফুছাকুম ওয়া আহলীকুম নারান’ অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো। (পারা-২, সূরা তাহরীম : আয়াত-৬)। আমরা জানি, মানুষের মন্দ আমল মানুষকে জান্নাত থেকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর নফ্স তথা কু-প্রবৃত্তিই মানুষকে মন্দের দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ্‌র বাণী : ‘ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিছ্ছুয়ী’ অর্থাৎ নিশ্চয় প্রবৃত্তি তো মন্দকর্মের নির্দেশদাতা (পারা, ১৩ সুরাই ইউছুপ : আয়াত-৫৩)। কুরআনের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হলো নফ্সের তাড়না মানুষকে মন্দের দিকে প্রভাবিত করে। আর মন্দ পরিহার করার অন্যতম তিরয়াক হচ্ছে অনর্থ পরিহার অর্থাৎ ‘ফানা আনিল হাওয়া’র অনুশীলন। নিম্নে কুরআন, হাদিস ও বুজুর্গদের বাণীর মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো।

নফ্সের পরিচয় : ‘নফ্স’ আরবি শব্দ, যার অর্থ জান, অস্তিত্ব বা সত্তা। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী : ওয়া ইউহাযু যিরুকুমুল্লহু” অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছেন (পারা ৩ সূরা-আলে ইমরান : আয়াত-২৮)। পবিত্র কুরআনে নফ্সের পরিচয় : ‘নফ্স’ শব্দটি পবিত্র কুরআনুল কারিমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। বিশেষ করে নফ্সের তিনটি দিক প্রণিধান যোগ্য প্রথমত ‘নফ্সে আম্মারাহ’ যা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করে (সূরা ইউছুপ : আয়াত-৫৩)। দ্বিতীয় ‘নফ্সে লাওয়ামা’ যা মানুষকে অনুতপ্ত হতে শেখায় (সূরা ক্বিয়ামাহ : আয়াত-২)। তৃতীয়ত নফ্সে মুৎমায়িন্না’ যা মানুষের আত্মাকে প্রশান্ত করে (সূরা ফজর : আয়াত-২৭)।

পবিত্র হাদিসের নফ্সের পরিচয় : প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : নফ্স তোমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু যা তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন করে।

প্রিয় আকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামগণকে (রিদুওয়ানুল করিম) প্রশ্ন করেন, এমন বন্ধুর ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা? যার স্বভাব হচ্ছে যদি তাকে সম্মান করো, খাবার দাও, কাপড় পরিধান করাও তাহলে সে তোমাদেরকে বিপদে ও মুসিবতে নিপাতিত করবে। আর যদি তুমি তাকে দুর্নাম করে অসম্মান করো, অভুক্ত রাখো তাহলে সে তোমাদের সাথে ভাল আচরণ করবে। সাহাবিগণ আরয করলেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ, এর থেকে নিকৃষ্ট বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। প্রিয় রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার জান : নফ্স যা তোমাদের সাথে রয়েছে সে এমনই এক বন্ধু।

বুযুর্গদের দৃষ্টিতে নফ্সের পরিচয় : (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন : নফ্স তথা প্রবৃত্তি এমন প্রভু যা অনর্থক কাজেই শান্তি লাভ করে। (২) হযরত জুননুন মিছরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- সকল অন্তরায় থেকে বড়ো অন্তরায় নফ্সের অনুসরণ। (৩) হযরত জুনায়দ বাগদাদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : কুফরির ভিত্তিই হচ্ছে নফ্সের এত্তেবা। (৪) হযরত আবু ছালমান দারানি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : নফ্স তথা প্রবৃত্তি আমাদের খেয়ানতকারী এবং আল্লাহ্র নৈকট্যে বাধা প্রদানকারী। (৫) ‘অছিয়ে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর রচিত ‘মূলতত্ত্ব’ নামক গ্রন্থে নফ্স সম্পর্কে মওলানা জালাল উদ্দিন রুমির (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বাণী তুলে ধরেন : তিনি বলেন, উটপাখি সদৃশ্য ফাঁকিবাজ নফ্সকে জবাই করতে হইলে পীরের ছায়া দরকার।

নফ্স তথা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের উপায় : নফ্স তথা প্রবৃত্তি যা মানুষকে গর্হিত কাজের দিকে ধাবিত করে, যা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মানুষ স্বীয় মনজিলে মকসুদে তথা অভিষ্ট লক্ষ্য আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছা অসম্ভব। নিম্নে ‘ফানা আনিল হাওয়া’র অনুশীলনের মাধ্যমে নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বর্ণনা করা হলো।

অছিয়ে গাউছুল আজম, খাদেমুল ফোক্‌রা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক রচিত মূল্যবান গ্রন্থ 'মানব সভ্যতা' কিতাবের ৯ম পৃষ্টায় উল্লেখিত 'গাউছিয়ত নীতি'র অন্যতম দ্বিতীয় মূলনীতি এবং 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' DIRI সংস্করণ ২০২২ এর ৭৩ নং পৃষ্টায় বর্ণিত সপ্তকর্ম পদ্ধতির দ্বিতীয় কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে 'ফানা আনিল হাওয়া' অর্থ্যৎ যাহা না হলে চলে, সেইরূপ কাজ কর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা, যার ফলে জীবন যাত্রা সহজ ও ঝামিলা মুক্ত হয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, নফ্‌স সর্বদা মানুষকে মন্দ কাজ, মন্দ চিন্তা এবং স্বভাবের দিকেই ধাবিত করে, আর এসব সহজভাবেই সম্ভব হয় অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ বা চিন্তার মাধ্যমে। অনর্থকতা পরিহারে নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব; যার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন, অনর্থ পরিহারেই ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি নফ্‌স তথা প্রবৃত্তি মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য থেকে ফিরিয়ে জিন শয়তানের বন্ধুতে পরিণত করে, আর 'ফানা আনিল হাওয়া'র অনুশীলন পারে, নফ্‌সের এই কঠিন থাবা থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করতে অনুশীলনই মহান প্রভু তাঁর প্রিয় বন্ধু তথা আউলিয়া কিরামগণ বিশেষত্ব হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর মাধ্যমে নফ্‌সের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করুন, আ-মী-ন। বিহুরমাতি মুর্শিদিলি আ-মী-ন, ওয়া আলাইহী ওয়া আসহাবীবী আজমাঈন।

লেখক :
সুপার, মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্‌রাসা
গামরীতলা, নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
দারুত-তায়ালীমের সম্পাদক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
হাটহাজারী উপজেলা কার্যকরী সংসদ।

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ‘গাউছিয়ত নীতি’র প্রভাব

✍ হাফেজ মুহাম্মদ শফিউল আলম হোসাইনী

ভূমিকা :

মাইজভাণ্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা
ঘুমাইওনা মায়ার ঘুমে আখের জামানা॥
খেদমতে হইলে দাখিল, এলমে লদুন হবে হাছিল,
দুস্ত দুশমন সমান হবে কীসের ভাবনা॥

আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, সেটি উপরি-উক্ত মাইজভাণ্ডারী কালামের চরণগুলোতে ফুটে উঠেছে। আর সেটি হচ্ছে ‘গাউছিয়ত নীতি’। বর্তমান অবক্ষয়, বিপর্যয়, খুন, চুরি ও ডাকাতি ইত্যাদিতে জর্জরিত সমাজের জন্য এই ‘গাউছিয়ত নীতি’ হচ্ছে, মরুভূমিতে বৃষ্টির মতো। এ সমাজ ব্যবস্থা নিরাময়ের জন্য, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক ঐশ্বরিক মহৌষধ। এই বিষয়ে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে গাউছিয়ত নীতি ও নৈতিকতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি :

গাউছিয়ত নীতি কী?

যে কোনো তরিকত বা সংগঠনের কিছু মূলনীতি বা নিয়ম থাকে, যাকে সেই তরিকতের প্রাণ বা মেরুদণ্ড বলা হয়।

অনুরূপ, ইমামুত তরিকত হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তিত, তরিকায়ে কাদেরিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া, প্রকাশ মাইজভাণ্ডারী তরিকা যে মূল নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তার একটি অংশ এই গাউছিয়ত নীতি।

অতএব, যারা মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রকৃত অনুসারী, তাদের এই গাউছিয়ত নীতি জানা, বোঝা ও পালন করা একান্ত জরুরি। কারণ গাউছিয়ত হলো কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মূল নির্যাস; যা বর্তমান বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য যুগোপযোগী ও

সময়োপযোগীও বটে। তাই এ প্রসঙ্গে অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সাহেব ইরশাদ করেছেন, 'উপরি-উক্ত গাউছিয়ত নীতিহীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী দাবি করা চলে না। তাই সমাজে 'গাউছিয়ত নীতি' বাস্তবায়ন করতে পারলে, সকল প্রকার অনাচার, অবিচার, জুলুম অত্যাচার সহ সকল প্রকার সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

সংক্ষেপে 'গাউছিয়ত নীতি' ও তার আলোচনা :

গাউছিয়ত নীতি :

১. তেলাওয়াতে অজুদ (فناء عن الخلق)
২. অনর্থ পরিহার (فناء عن الهوى)
৩. সন্তোষ (الرضاء)

১। তেলাওয়াতে অজুদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

তেলাওয়াতে অজুদ (تلاوة وجود) শব্দটি আরবি। যা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হচ্ছে تلاوة (তেলাওয়াত)। যার অর্থ হচ্ছে পড়া (قرأة)। অধ্যয়ন করা, (تذكرة) فكر ইত্যাদি। অজুদ (وجود) শব্দের অর্থ, দেহ (البدن)। অস্তিত্ব (الاقامة)। ইত্যাদি। সম্পূর্ণ অর্থ হয়, দেহের অধ্যয়ন, বা নিজেকে নিয়ে চিন্তা ফিকির করা।

পরিভাষায় তেলাওয়াতে অজুদের পরিচয় :

অছিয়ে গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এভাবে দিয়েছেন যে, নির্জন সময়ে নিজের গত দিনের ভালো মন্দ কর্মের বিচার, চিন্তা, ধ্যানের মাধ্যমে মন্দের জন্য অনুতাপ,অনুশোচনা, ভালোর জন্য নিজ পীরের আনুগত্য এবং খোদার সাহায্য কামনার নামই তেলাওয়াতে অজুদ বা মুরাকাবা, মোশাহিদা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র পবিত্র কুরআন শরিফে রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শোয়ার মধ্যে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা (ধ্যান) করে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)। আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝٥٠

(হে মাহবুব), আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি তবে সমান হয়ে যাবে? তবে কি তোমরা গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা (ধ্যান) করছোনা? (সূরা আনয়াম : আয়াত ৫০)।

উপরি-উক্ত আয়াত ছাড়াও আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা নির্জন সময়ে বসে গভীর ধ্যান ও চিন্তা ভাবনা করার গুরুত্ব তুলে ধরে তা করার দিকে বান্দাহকে উৎসাহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত শায়খ গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

الصوفى من كان صافيًا من افات النفس خاليًا من مذموماتها سالكًا لحميد مذاهبه ملازمًا للحقائق غير ساكن قلبه الى احد من الخلائق

দরবেশ বা অলি তিনিই, যিনি কু-প্রবৃত্তির বিপদ থেকে মুক্ত, নিরাপদ, প্রশংসিত পরিচালিত সত্য কে অনিবার্য রূপে গ্রহণ করেছেন, সৃষ্টির সব কিছুর সাথে অন্তর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং নিজের (ভালো-মন্দের) ব্যাপারে (ধ্যান) চিন্তা করেছেন। তাই হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

من عرف نفسه فقد عرف ربه

যে নিজেকে চিনেছে তো, সে আল্লাহ কেও চিনেছে। এজন্য অছিয়ে গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কতই সুন্দর ভাবে ইরশাদ করেছেন :

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে
বাক-বিতন্ডা পরিহারে
জানার আগ্রহে,
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি তেলাওয়াতে অজুদ তরিকতের রাস্তায় অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনর্থ পরিহার (فناء عن الهوى)

অনর্থ পরিহার করা বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন,

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ؕ﴿٤١﴾

অর্থাৎ আর সেই ব্যক্তি যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করে, এবং সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় কাজ বা কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তবে নিশ্চয় তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। (সূরা আন-নাজিআত : আয়াত ৪০-৪১) আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ ব্যাপারে আরও ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿٣﴾

অর্থাৎ, আর যারা অনর্থক কাজ ও কথা বার্তা থেকে বিরত থাকে। (তারাই সফল) (সূরা মু'মিনুন : আয়াত-৩) হযরত রাসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যাদের আমি বেশি অপছন্দ করি এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে, তারা হলো সে সব ব্যক্তি যারা অনর্থক কথা বার্তা বলে এবং অন্যকে ছোটো করে ও কথা বলার মাধ্যমে নিজেকে জাহির করে। (সুনানে তিরমিজি)

এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে, যেখানে অনর্থক কথা বার্তা ও কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ নিয়ামত প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

সন্তোষ (الرضاء)

এটা হলো সর্বাবস্থায় বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার উপর সন্তোষ থাকা। এর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

الرضاء هى الرضاء بها اعطى الله

সন্তোষ হলো,আল্লাহ তায়ালা বান্দাহকে যা দিয়েছেন তার উপর বান্দাহ সন্তুষ্ট থাকা। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন,

الرضاء بما دون الكفاية وترك التشؤف الى المفقود والاستغناء بالموجود

সন্তোষ হলো, অপর্যাপ্ত বিষয়েও তুষ্ট থাকা, অধিক পরিমাণ পাওয়ার লোভ পরিত্যাগ করা এবং যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন করিমে ইরশাদ করেন,

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

অর্থ্যৎ আপন চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করে ঐ বস্তুর প্রতি থাকাবেন না, যা আমি তাদের কিছু সংখ্যক যোগাল (ব্যক্তিদের) দিয়েছি এবং তাদের জন্য দুঃখিত হবেন না। (সূরা হিজর : আয়াত ৮৮) হযরত ইমাম শওকানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى بما اعطى الله تعالى – ولكن المراد من اية الله تعالى لجميع المؤمنين منا -

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ঈমানদারগণ। সন্তোষ সম্পর্কে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه -

সে ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজনীয় রিজিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে অল্পে সন্তোষ প্রদান করেছেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের যে নির্যাস তা হচ্ছে হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা প্রদর্শিত তরিকার 'গাউছিয়ত নীতি'। যা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তুষ্টি অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক। এবার মূল বিষয়টি আরও বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরার জন্য নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

নৈতিকতা কী?

নৈতিকতা এটি বাংলা শব্দ। আরবি হচ্ছে أسوة ، ادب ، اخلاق ইত্যাদি। ইংরেজিতে Moral বলা হয়। তরিকতের পরিভাষায় নৈতিকতা হয়

الاخلاق او الادب لطاعة الله تعالى ورسوله والنهى عن المنكر

নৈতিকতা বলা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিঃশর্ত আনুগত্য করা এবং যা নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকা। সর্বোত্তম নৈতিকতা ও চরিত্রের মডেল হচ্ছে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এ ব্যাপারে কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অনুসরণই উত্তম আদর্শ (নৈতিকতা)। (সূরা আহযাব : আয়াত ২১)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤

হে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা কলম : আয়াত ৪)। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

يبيع اقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا

অনেক সম্প্রদায় পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে তাদের চরিত্র (নৈতিকতা) ও ধর্ম কে বিক্রি করে দিচ্ছেন। হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا -

মু'মিনগণের মধ্যে তিনিই পূর্ণ মু'মিন যিনি নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। (সুনানে আত তিরমিযি)

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, নৈতিকতা হচ্ছে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিঃশর্ত অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তিনি যা করতে বলেছেন তা করা ও যা নিষেধ করেছেন তার থেকে বিরত থাকা। আর হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ তাঁর পবিত্র আহলে বায়াতের অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে নিহিত।

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم انى خلفت فيكم اثنين لن تضلوا
بعد هما ابدا كتاب الله ونسبى ولن يتفرقا حتى يردعلى الحوض -

আমি তোমাদের জন্য দুটি প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি (যদি তোমরা এদের শক্ত ভাবে আকড়ে ধর) তাহলে তোমরা কখনও পথ-ভ্রষ্ট হবেনা। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন এবং আমার বংশধর (আহলে বায়াত)। এরা উভয় হাউজে কাউছারে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার পূর্বে (অর্থাৎ কুরআন ও আহলে বায়াত) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। (কাশফুল আসতার ৩:২২৩ ২৬১৭) তাই ইমামুল আউলিয়া হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ ছাহেব কেবলা কাবা প্রদর্শিত 'গাউছিয়ত নীতি'র অনুসরণ ও অনুকরণ হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ ও অনুকরণ এর নামান্তর।

এ পযার্য়ে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করছি।

১. তেলাওয়াতে অজুদ : এটি যদি কোনো ব্যক্তি নির্জন সময়ে বসে নিয়মিত পালন করেন, তার মধ্যে নিম্নোক্ত পরিবর্তন গুলো অবশ্যই আসবে।

১ নিজের কাজের ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।

২ নিজের বিবেক বোধ দিন দিন জাগ্রত হবে।

৩ নিজের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংশোধনের মনোভাব সৃষ্টি হবে। যাকে সুফি ভাষায় لوامة বলা হয়।

৪ নিজের দোষ-ক্রটি সংশোধন করার ফলে, নিজের মধ্যে ফেরেশতা চরিত্রের সমাবেশ হবে। যেমন : হযরত কেবলা কাবা বলেছেন, "ফেরেশতা কালেব বনিয়া যাও।"

৫ নিজের পীর ও মুর্শিদের মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। যা ইশকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ইশকে ইলাহির দিকে কলব কে ধাবিত করবে।

৬ মহান আল্লাহ্‌র নেয়ামত সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে।

৭ নিজের চরিত্র সংশোধন করার ফলে গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ এবং ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৮ দুনিয়া থেকে আখিরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

২. অনর্থক কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকা

এটা দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলনের কারণে তার জীবনে নিম্নোক্ত পরিবর্তন অবশ্যই আসবে :

১ জীবন যাপন সহজ হয়ে যাবে; পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয়ে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হবে।
২ পরনিন্দা, পরচর্চা, অশ্লীলতা ইত্যাদি চরিত্র থেকে দূর হয়ে যাবে।
৩ জীবনে অপব্যয় থেকে মুক্ত হয়ে সচ্ছলতা চলে আসবে।
৪ দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবে।
৫ শারীরিক ও মানসিক অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাবে।
৬ যেনা, ব্যভিচার ও অশ্লীল বাক্যালাপ ইত্যাদি করার মন-মানসিকতা অন্তর থেকে দূর হয়ে, অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবে।
৭ ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে।
৮ সকলের নিকট দিন দিন প্রিয়ভাজন হবে।

৩. সন্তোষ (الرضاء)

এটা পালনে নিজের চরিত্রের নিম্নোক্ত পরিবর্তন অবশ্যই আসবে :

১ মন থেকে সব ধরনের লোভ-লালসা দিন দিন কমে যাবে।
২ ঘুস, দূর্নীতি, সুদ সহ অবৈধ পথে উপার্জন করার মানসিকতা মন থেকে আস্তে আস্তে চলে যাবে।
৩ অল্পে তুষ্টি অন্তরের মধ্যে প্রিয় হয়ে যাবে।
৪ মিথ্যা বলা, অনাচার, অবিচার, জুলুম ও অত্যাচার ইত্যাদির প্রতি প্রবল ঘৃণা জন্মাবে।
৫ জীবনে সকল ভালো কাজে সফলতা আসবে।
৬ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কোনো পরীক্ষায় ধৈর্য বা সবর শক্তি অর্জিত হবে।
৭ সৎচিন্তা, সৎকাজ, সৎসঙ্গ, সৎস্বভাব ও সৎজীবন ইত্যাদি ভালো গুণগুলো চরিত্রের ভূষণ হয়ে যাবে। যেমন কুরআন পাকের বাণী, এ ধরনের আত্মাকে নির্দেশ করে।

یایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربك راضية مرضية – فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی –

অর্থাৎ বলা হবে : হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতি পালকের নিকট ফিরে এসো, সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর তুমি

আমার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

৮ সর্বোপরি, সে ইনসানে কামেল বনে আল্লাহ্‌র বন্ধুই (ولى) পরিণত হবে। সে হবে জগৎবাসীর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক উপহার ।

তাই এ তিনটি ‘গাউছিয়ত নীতি’ যদি ধারাবাহিক ভাবে কোনো ব্যক্তি লালন ও পালন করে, তার মধ্যে মাইজভাণ্ডারী তরিকার মূলনীতি সপ্ত পদ্ধতির সবগুলো পদ্ধতি চলে আসবে। সেই ছালেক ব্যক্তি মুর্শিদ কেবলার নেক নজরে নফ্‌সে ইনসানি থেকে রুহে ইনসানিতে পরিণত হয়ে ইনসানে কামেল বনতে পারবে।

প্রেমিকের ভাষায় বলতে হয়,

কলব জিন্দা হয়ে যাব,
মাবুদের দিদার পাবে।
নিজের রূপ দেখিয়া হবে নিজে দিওয়ানা।

অতএব, আমাদের সবাইকে মুর্শিদে আজম সাজ্জাদানশিনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) মধ্যস্থতায় এই ‘গাউছিয়ত নীতি’ আমাদের জীবনে, পরিবারে ও সর্বোপরি সমাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কে সুস্থ, সুন্দর ও আলোকিত সমাজ হিসেবে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। বেহুরমতে ছৈয়্যদিল মোরসালিন।

লেখক :
দারুত-তায়ালীমের সম্পাদক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
ফটিকছড়ি উপজেলা কার্যকরী সংসদ

حقيقة الفناء عن الإرادة وأهميته في الحياة

✍ محمد قمرالحسـن قادري

نحمد الله فاطر السماوات والارضين القائل (اياك نعبد واياك نستعين) والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وإمام المرسلين محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين واولياء أمته المكرمين ، أما بعد،،،

فان من مقاصد الاسلام تزكية نفوس العباد وتصفية قلوبهم من شوائب الشرك الأكبر والأصغروإخراجهم من غياهب الظلمات الى النور فلذا استمد عباد الله المصطفين وأوليائه المكرمين مختلف السبل والمناهج والطرق لعباده المحبين كي لا يقعون في وساوس الشياطين ولا يتبعون خطوات ابليس اللئيم ويستقيمون علي دينه القويم ويجتنبون من الطاغوت ويتوكلون علي الله الواحد الأحد الفرد الصمد ويعتمدون عليه في كل حال من الأحوال وكل حين من الأحيان ويعبدونه مخلصين ولا يشركون به شيئا، كما اقتطف الشيخ سيد العارفين خادم الفقراء والمساكين السيد دلوار حسين ميزبنداری "الأصول السبعة" لأهل الإيمان والاسلام الذين يبتغون وجه الله دائما ابدا ويريدون ان يسلكوا في طريق رضوانه وإرادته ويكونوا ابدا عباد الله المخلصين والمقبولين وهي مكونة من مراحل الاموات الأربعة والفناء الثلاثة. نحن نبين هنا احد اقسام الفناء وهو "الفناء عن الإرادة"

فأما الفناء عن الإرادة هو ان يغلب ارادة الله على ارادة العبد في كل زمان ومكان وفي كل حين من الأحيان وترك ارادته ورغبته لمرضات ربه كما قال الشيخ السيد دلوار حسين ميزبنداري في كتابه الشهير " الولاية المطلقة ".علما بأنه مقارب لمعنى توحيد الألوهية، قال ابن القيم في مدارج السالكين :أما الفناء عن الإرادة خواص الأولياء وأئمة المقربين وهو الفناء عن إرادة السوى شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه، سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبه ـ أعني المراد الديني الأمري، لا المراد الكوني القدري ـ فصار المرادان واحدا، فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب، وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب، فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم، فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، وبحبه، وخوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والاستعانة به، والطلب منه، عن حب ما سواه وخوفه، ورجائه، والتوكل عليه، ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا له، ولا يمنع إلا له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلايعادي من عادى الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه، بل :يعادي الذي عادى من الناس كلهم ... جميعا ولو كان الحبيب المصافي ـ وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه، والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة، وعملا وحالا وقصدا، وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء، فيفنى عن تأليه ما سواه علما وإقرارا وتعبدا، ويبقى بتأليهه وحده، فهذا الفناء وهذا البقاء

هو حقيقة التوحيد الذي عليه المرسلون، وأنزلت به الكتب، وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت له الشرائع، وقام عليه سوق الجنة، وأسس عليه الخلق والأمروسلك عليه اولياء واصفيائه الكرام.

كما ان فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص وهو في الحقيقة عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألفه وإنابته وتوجهه الى الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من العارف والاحوال . وليس لأحد خروج عن هذا وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه (الا من اتى الله بقلب سليم) سورة الشعراء/الآية :٨٩ وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك . وهذا (الفناء) لا ينافيه البقاء ، بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيا عن إرادة ما سواه وان كان شاعرا بالله وبالسوى ، وترجمته قول : لا إله الا الله وكان النبي صليى الله عليه وسلم يقول " لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن" وهذا في الجملة هواول الدين وآخره.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي. فإنَّ الفناء ثلاثة أنواع ومنها نوع للكاملين مِنَ الأنبياء والأولياء ونوع للقاصدين مِنَ الأولياء والصالحين ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يجب الا الله ولا يعبد الا اياه ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب غيره وهو المعنى الذى يجب ان يقصد بقول الشيخ ابى يزيد حيث قال اريد ان لا اريد الا ما يريد اى المراد المحبوب المرضى وهو المراد بالارادة الدينية وكمال العبد ان لا يريد ولا يجب ولا يرضى الا ما اراده الله ورضيه واحبه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ولا يجب الا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا معنى قولهم فى

قوله الا من أتى الله بقلب سليم قالوا هو السليم مما سوى الله او مما سوى عبادة الله او مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله.

فلذا أمر الله نبيه الكريم ان يربط إرادته مع إرادة الرب الجليل كما جاء في سورة الكهف "(ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله) سورة الكهف/الأية-٢٣. يفهم من الآية الكريمة لا مجال للعباد ان يلحق نفسه بالأمور الدنيا بدون مشية الله وإرادته القدسية كذا أمر في الأية المذكورة بأعلاه ألا يقول في أمر من الأمور اني أفعل غدا كذا وكذا الا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عزوجل حتى لا يكون محققا لحكم الخير ، فإنه إذا قال : لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا. وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر عنه.واللام في قوله تعالي لشيء بمنزلة " في" أو كأنه لأجل شيء.

وتوكل العباد أيضا من ثمرة الفناء عن الإرادة كما ان الإنسان اذا توكل عليه حق توكله فالله حسبه في كل الامور كما جاء في القران الحكيم (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) سورة الطلاق/الأية-٣. وجاء في الحديث الشريف ان العبد اذا توكل عليه بخالص التوكل يرزقه كرزق الطير كما قال عليه الصلاة والسلام " عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ : (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) رواه الترمذي. في هذا الحديث ضرب النبي صلي الله عليه وسلم مثلا المتوكل على الله مع الطير الذي يخرج من عشته ووكره ضامرة البطون وليس في بطونه شيء ولا يسعى للرزق بزرع اي حقول ومزرعات ولكن الله الرزاق يرزقه فيرجع الي عشته بطانا وقت المساء كما ان العبد المتوكل اذا بلغ في درجة الفناء عن الإرادة بحق التوكل على الله ليرزقه الله كما يرزق الطير وهذا منزلة عليا للتوكل

الذي تنشئ من نفوذ وتأثير الفناء عن ارادة ما سوى الله وينبت من جزر شجره.

وجدير بالذكر اذا كان العبد استسلم نفسه الى ربه من كل ناحية حتى ارادته ومشيته ورضاه وكراهيته في شيء فتقرب اليه بها العبد حتى اصبح بها وليا له وحصل له الكمال ونال بها الدرجة الرفيعة عند الله . فلذا قال الشيخ العارف سيد دلوار حسين ميزبنداری في الولاية المطلقة " اذا بلغ العبد في مقام الفناء ستحصل له الحياة الطيبة والمعيشة الواسعة وكل شيئ يكون له يسرا وسهلا حتى سهل الله له الطريق الى الجنة ووسائل الفوز والفلاح ولا يمسه أية كربة من كرب الدنيا ولا هم وغم ولا حزن ولا خوف كما قال الله تعالي في شان اوليائه المكرمين (الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) سورة يونس/ الآية:٦٢. يعني خوف في الحياة الدنيا وحزن في الحياة البرزخية والأخروية. وان الله يحب العبد المتوكل الذي يتوكل عليه في كل مجال وحال ولا يتوتر بشيئ ولا يحزنه ولا يخوفه شيئ في الدنيا وكل شيئ يفوض الى الله الرب الجليل ويقول ابدا " حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولي نعم النصير" تطمئن به قلوب العبد المتوكل وايضا يصدق بقوله سبحانه (فعال لما يريد) سورة البروج/ الآية: ١٦. كل شيء يكون وفق مشيئته وارادته لا حسب إرادته ويوافق ابدا مع ارادة ربه وهو الرب الغفور وحسبه في الأمور.

فالحقيقة ان الفناء عن الإرادة هو مقام لاهل الولاية والمعرفة الذين يسيرون ابدا في حب الله وابتغاء مرضاته ومستغرقون في بحر لجي لطلب معرفة الرب الرحيم وهذا مقام الرضا والتسليم كما ذكر صاحب "الولاية المطلقة" الشيخ السيد دلوار حسين ميزبنداری وهم رجال الله ينسبون إرادتهم ابدا مع ارادة ربانية ويسندونها الى ارادته كما قال تعالي في القرآن المجيد: (وَمَا

تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) سورة التكوير/الآية:٢٩. وقوله : (وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) سورة المدثر/الآية:٥٦ ، ولا شك أن الله تعالى قد أعطى العباد مشيئة تناسبهم، ولكن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله، فلا يشاؤون إلا ما شاء الله، فهو أولاً أثبت لهم المشيئة : (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) سورة التكوير:الآية/٢٨ ، ثم ربط مشيئتهم بمشيئته. بقوله تعالي : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) سورة التكوير/الآية:٢٩ ، ومن هنا نعرف أن مشيئة الله تعالى غالبة لمشيئة العبد وهذا حقيقة الفناء عن الإرادة كما شرح صاحب "الولاية المطلقة".

وأهميته في حياة الانسان كثيرة جدا، اذا اراد الانسان ان يكون عبد الله المخلص والمقبول فعليه السلوك والسير في هذا الطريقة ومن عدمه لن ينال مقام العبودية الفائقة والسامية ، فعباد الله المتقين والمتوكلين يفنون حياتهم ويفدونها في مشيئة الله وإرادته الربانية ولا يتوكلون ولا يعتمدون قط على أحد في الدنيا لنيل منالهم والحصول على محاصيلهم فيصيرون كالطير يصبحون ويمسون على رضوان الله ومعرفته ويقنعون بذلك دائما ويتحققون في حياتهم هذا القول الصواب " من له المولى فله الكل....

<u>عبارة مدارج السالكين لابن القيم الجوزي</u>

فنَاءُ خَوَاصِّ الْأَوْلِيَاءِ وَأَئِمَّةِ الْمُقَرَّبِينَ وَهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ إِرَادَةِ السِّوَى، شَائِمًا بِرقِّ الْفِنَاءِ عَنْ إِرَادَةِ مَا سِوَاهُ، سَالِكًا سَبِيلَ الْجَمْعِ عَلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، فَانِيًا بِمُرَادِ مَحْبُوبِهِ مِنْهُ عَنْ مُرَادِهِ هُوَ مِنْ مَحْبُوبِهِ، فَضْلًا عَنْ إِرَادَةِ غَيْرِهِ، قَدِ اتَّحَدَ مُرَادُهُ بِمُرَادِ مَحْبُوبِهِ - أَعْنِي الْمُرَادَ الدِّينِيَّ الْأَمْرِيَّ، لَا الْمُرَادَ الْكَوْنِيَّ الْقَدَرِيَّ - فَصَارَ الْمُرَادَانِ وَاحِدًا.

وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ اتِّحَادٌ صَحِيحٌ إِلَّا هَذَا، وَالِاتِّحَادُ فِي الْعِلْمِ وَالْخَبَرِ، فَيَكُونُ الْمُرَادَانِ وَالْمَعْلُومَانِ وَالْمَذْكُورَانِ وَاحِدًا، مَعَ تَبَايُنِ

الْإِرَادَتَيْنِ وَالْعِلْمَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ، فَغَايَةُ الْمَحَبَّةِ اتِّحَادُ مُرَادِ الْمُحِبِّ بِمُرَادِ الْمَحْبُوبِ، وَفَنَاءُ إِرَادَةِ الْمُحِبِّ فِي مُرَادِ الْمَحْبُوبِ.

فَهَذَا الِاتِّحَادُ وَالْفَنَاءُ هُوَ اتِّحَادُ خَوَاصِّ الْمُحِبِّينَ وَفَنَاؤُهُمْ، فَنَوْا بِعِبَادَةِ مَحْبُوبِهِمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَبِحُبِّهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ، وَالطَّلَبِ مِنْهُ، عَنْ حُبِّ مَا سِوَاهُ، وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ.

وَمِنْ تَحْقِيقِ هَذَا الْفَنَاءِ :أَنْ لَا يُحِبَّ إِلَّا فِي اللَّهِ وَلَا يُبْغِضَ إِلَّا فِيهِ، وَلَا يُوَالِيَ إِلَّا فِيهِ، وَلَا يُعَادِيَ إِلَّا فِيهِ، وَلَا يُعْطِيَ إِلَّا لَهُ، وَلَا يَمْنَعَ إِلَّا لَهُ، وَلَا يَرْجُوَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَا يَسْتَعِينَ إِلَّا بِهِ، فَيَكُونُ دِينُهُ كُلُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلَّهِ، وَيَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، فَلَا يُوَادُّ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، بَلْ:

يُعَادِي الَّذِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ ... جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُصَافِيَا

وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ فَنَاؤُهُ عَنْ هَوَى نَفْسِهِ وَحُظُوظِهَا بِمَرَاضِي رَبِّهِ وَحُقُوقِهِ.

وَالْجَامِعُ لِهَذَا كُلِّهِ تَحْقِيقُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً، وَعَمَلًا وَحَالًا وَقَصْدًا.

وَحَقِيقَةُ هَذَا النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ هُوَ الْفَنَاءُ وَالْبَقَاءُ، فَيَفْنَى عَنْ تَأْلِيهِ مَا سِوَاهُ عِلْمًا وَإِقْرَارًا وَتَعَبُّدًا، وَيَبْقَى بِتَأْلِيهِهِ وَحْدَهُ.

الفناء مِنَ المصطلحات التي تداولها مَنْ يعنون بالتزكية النبوية المباركة وغيرهم في فترة مِنْ الفترات وتعاملوا بها للتعبير عن حالة خاصة مِنَ المحبة، فهو بيان لدرجة مِنْ مراتب المحبة يغيب فيها المحب عن محبوبه حبا يجعله منساقا لكلّ مراده فلا يملك إلا الطاعة لأوامره وحُبِّ كلّ ما يتعلق به.

فالفناء في الشيخ يكون إذا حصلت المحبة له، وهو متّصل بسيّدنا المصطفى صلَّى الله تعالى وسلم عليه وآله وصحبه أهل

الفضل والوفا بالسند الصحيح، عندها يترك المريد مراده لمراد شيخه، ومراده هو أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم وبالنتيجة فمحبة الشيخ تُسهِّل على السالك تطبيق الشريعة الإسلامية على أكمل الوجوه. وإنَّما يتحقق الفناء به مِنْ خلال اتباعه بحيث يتخلق السالك بأخلاقه، ويتحلّى بأحواله، ويعمل بتوجيهاته، ويلتزم إرشاداته، على وفق الآداب المقررة ولعل بعضا ممَّا يشير إلى هذا المعنى قول سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله سبحانه عنه) لقد أحببت عمر حتى لقد خفت الله، ووددت أنَّي كنت خادما لعمر حتى أموت (الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد.

أمَّا الفناء في حضرة خاتم النبيين صلَّى الله تعالى وسلّم عليه وآله وصحبه أجمعين فهو أصل مِنْ أصول الدين وهو المقصود بما روى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه) كنَّا مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنتَ أحبُّ إليّ مِنْ كلّ شيء إلا مِنْ نفسي، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنّه الآن، واللهِ لأنتَ أحبُّ إليّ مِنْ نفسي، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: الآن يا عمر (وكذلك في قول حضرة النبي المكرَّم صلَّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم) ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أنْ يكون اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه ممّا سواهما، وأنْ يحبّ المرء لا يحبّه إلا لله، وأنْ يكره أنْ يعودَ في الكفر كما يكرهُ أنْ يُقْذَفَ في النار (الإمام البخاري رحمه الرحمن تبارك اسمه).

تحرير:

مترجم البعثة العسكرية البنغلادشية لدى الكويت

লুটাই ললাট

✍ **মাহ্‌দী গালিব**

এ অধ্যায়ের আরম্ভ ১৭৬০ থেকে।[1] ঔপনিবেশিক পতাকা উড়ছে পতপত। বাংলা ধবল ইংরেজের করতলগত, পদপিষ্ট। এর পাঁচ বছরের মধ্যে আসে 'দ্বৈতশাসন'।[2] এক কিম্ভূতকিমাকার শাসনব্যবস্থা। কথিত নবাব পায় ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। আর 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' পায় দায়িত্বহীন ক্ষমতা। শুরু হয় নিকৃষ্টতর লুট। ফলাফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।[3] মরে সাফ হয় এককোটি মানুষ। মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ।[4] শুধু লুটের আনন্দে এমন নীচ-নারকীয়তা খুব কম দেখছে পৃথিবী।

ঔপনিবেশিক দানব বাড়ে ক্যান্সারের মতো। ছড়ায় প্রায় পুরো পৃথিবী। প্রবাদ ছিল—ব্রিটিশ শোষিত সীমায় সূর্য ডুবে না।[5] লেখাটি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ছে। হচ্ছে হোক। সবক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার সহনশীলতা আমার নেই। অক্ষমতা স্বীকার করছি।

---

১ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৩১ পৃষ্ঠা। 'নূতন হুকুমত ধর্মীয় রীতিনীতি প্রভাব শূন্য হওয়ায় এক নব যুগের সূচনা হয়'।
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, জীবনী ও কারামত, ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2 Dual Government in Bengal (1765-1772)-Significance and Impact (sansarlochan.in)

3 Visaria, Leela; Visaria, Praveen (1983), "Population (1757–1947)", in Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India: Volume 2, C.1757-c.1970*, Cambridge University Press, pp. 463–522, ISBN 978-0-521-22802-2

4 Amartya Sen, 1982, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation.

5 George Macartney (1773). An Account of Ireland in 1773 by a Late Chief Secretary of that Kingdom. p. 55.; cited in Kenny, Kevin (2006). Ireland and the British Empire. Oxford University Press. p. 72, fn.22. ISBN 0-19-925184-3.

মোটকথা, ঔপনিবেশিক জ্বরাসুরে আক্রান্ত হয় প্রায় পুরো প্রতীচ্য। আফ্রোশিয়া[6] অঞ্চল চুষতে থাকে পৈশাচিক পিপাসায়। এরই ধারাবাহিকে আসে শিল্পবিপ্লব।[7] বাংলার সম্পদ স্ফীত বুকে ঢোকে চিরক্ষুধার্ত পুঁজিবাদ।[8] মানবতার স্পষ্ট, তবুও অগ্রাহ্য শত্রু।

পুঁজি ও বাজার টেকসই করতে দরকার উপনিবেশের স্থায়িত্ব। উপনিবেশসমূহ থেকেই মিলত কাঁচামাল। আসে 'ভাগ করো, শোষণ করো' নীতি—ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি।[9] বাজার টেকাতে দরকার সস্তা শ্রম, বা দাসানুদাসিক শ্রমব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক গর্ভাশয়ে জন্মায় তাই নবীন এক 'শ্রমদাসশ্রেণি'। যারা আমৃত্যু শ্রম দিবে, ফোলাবে পুঁজিপেটর লিপ্সাচর্বি। বাজার রক্ষায়, কাঁচামাল জুটাতে শুরু হয় 'নৃতত্ত্ব ধ্বংস'।[10] যে জমিতে পাট ছাড়া কিছু জন্মে না, যে চাষি ধানের ঘ্রাণে বুক ভরে—সে জমিতে এলো নীলের নৈরাজ্য।[11] চাষি হারায় আউশ-আমনের আগমন। বুকে ঘ্রাণের বদলে পিঠে পায় বেত্রঘাতের বিভীষিকা।

নৃতত্ত্ব ধ্বংস শুধু কৃষি ও উৎপাদনে আটকে থাকেনি। শ্রমদাসশ্রেণির যদি মানসিকতা বিকশিত হয়, যদি তারা বুঝতে পারে, উৎপাদনচক্রের যাবজ্জীবন কয়েদি তারা—তাহলে? তাই এদের মানসিকভাবেও পঙ্গু করতে হবে। কেড়ে নিতে হবে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, স্বজাত্যবোধ,

---

[৬] আফ্রিকা ও এশিয়া।

[7] "Industrial History of European Countries". European Route of Industrial Heritage. Council of Europe. Retrieved 2 June 2021.

[8] Unit-01.pdf (ebookbou.edu.bd), page 09.
ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলায় অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং বাংলার অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়; কিন্তু বিশ্ব-পুঁজিবাদের সঙ্গে এই সংযুক্তির ফলে বাংলা অঞ্চলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও কাঠামোর কোনো উন্নতি হয় না।

[9] Shashi Tharoor (2017). Inglorious Empire: What the British Did to India. Hurst. p. 101. ISBN 978-1-84904-808-8.

[১০] নৃতত্ত্ব বলতে আবহমান ও সহজাত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বুঝাচ্ছি।

[১১] সুপ্রকাশ রায় (১৯৯৩), *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড।

সৃজনশীলতা। করতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসাড়, জড়প্রায়। তাই উষ্ণ আফ্রিকায় জুলুদের ধরে ধরে জিন্স পরাও। ভারতে পরাও হাফপ্যান্ট। ভারতের সাবেক শাসকদের বোঝাও, হাফপ্যান্টের মতোই তোমাদের শরিয়ত হাঁটুর উপর উঠিয়ে ছেড়েছি। শ্রীলঙ্কাকে সিলন বানাও। বাংলা কে বানাও 'বেঙ্গল'। চট্টগ্রাম-চাটগামকে বানাও চিটাগং। বিচারালয়ে-কার্যালয়ে-ব্যাবসায় ঢোকাও ইংরেজি। একটি শিক্ষিতশ্রেণিকে রাতারাতি নিরক্ষর করে দিতে, এর থেকে ভালো উপায় আর কী হতে পারে!

ক্রিয়া হলে প্রতিক্রিয়াও হয়। ঔপনিবেশিক আগ্রাসন তখন শীর্ষে। এলো ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন; একে তারা বলে 'সিপাহি বিপ্লব'। আমরা ব্যর্থ হই। হারি নিজের অযোগ্যতার কাছে।

এই সময়ে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) নিজ গ্রাম-মাইজভাণ্ডারে ফিরে আসেন। শুরু করেন ঐক্য-প্রক্রিয়া। এ ঐক্য মানুষে-মানুষে। এ ঐক্য মানুষ ও জীবনবোধের। এ ঐক্য জীবনবোধ ও স্বাধীনতার। এ ঐক্য স্বাধীনতার সাথে স্বেচ্ছা-সমর্পণের। সমর্পণ স্রষ্টার কাছে। এক ও একক দয়াময়ের দরবারে।

ঔপনিবেশিকতার ধর্ম পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যই শোষণ। শোষণের মৌল অমানবিকতা। অন্যদিক, গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) শেখান—মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ববোধ। মনুষ্যত্ববোধ মানেই মানবতা। মানবতা মানেই দয়া। আর কে আছে আল্লাহ্‌র মতো দয়াময়!

গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) দেখলেন, পৃথিবীতে কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা নেই। যে কয়েকটা বিক্ষিপ্তভাবে আছে, তাও নিভুনিভু।[12] মানুষকে প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয়ভাবে, আইনের মাধ্যমে,

[১২] সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, ২০ পৃষ্ঠা, 'যুগ পরিবর্তন' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নেই। মানুষকে বেঁধে কোনও কিছুর জন্য বাধ্য করা যাবে না।

যেখানে আইন অকার্যকর, বিধান বিস্মৃত—সেখানে নৈতিকতাই একমাত্র ভরসা।[13] যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে আইন বাধ্য করতে পারে না; কিন্তু নৈতিকতা মানুষকে-ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিতে দায়বদ্ধ করে। অর্থাৎ এভাবে বলা যায়, নৈতিকতা ব্যক্তির আইন।

তাই মানুষের নৈতিকতাকে গড়ে তোলার, ইমিডিয়েট সাহায্য করার, ত্রাণ করার কৌশল করেন গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। মনুষ্যমননে এমন নৈতিকতা আঁকেন, যেখানে মানুষ হবে,

i. আত্মনির্ভর
ii. অপচয়হীন
iii. সহনশীল

এ তিন ধাপকে একত্রে বলা হয় 'ফানায়ে সালাসা'।[14] একে 'গাউছিয়ত নীতি'ও বলা হয়।[15]

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ধাপকে বলা হয় 'ফানা আনিল খালক'।[16] এর শাব্দিক অর্থ—সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়া। নিজের কাজ নিজে করা। গর্তে পড়েছি, কেউ উদ্ধার করবে, এমন চিন্তা না করা। নিজে নিজে উঠে আসতে সচেষ্ট হওয়া, এই 'সচেষ্টা' মানুষকে নিজ সক্ষমতা আবিষ্কারে বাধ্য করে। যেখানে ঔপনিবেশিকতা টুঁটি টিপে মারে মানুষের অমিত সম্ভাবনা, বানিয়ে রাখে নপুংসক শ্রমদাস—সেখানে গাউছুল

---

১৩ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, জীবনী ও কারামত, ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'দায়িত্ব কেবল মাত্র বিবেক ও সৎজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে'।

১৪ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মানব সভ্যতা, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৬ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মানব সভ্যতা, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) পুরো বিপরীত নয় কি? উপনিবেশবাদ মানুষকে বানায় মর্যাদাহীন উৎপাদনযন্ত্র। আর তিনি মানুষকে গড়েন আত্মমর্যাদাময় ব্যক্তিত্বে।

দ্বিতীয় কৌশল—‘ফানা আনিল হাওয়া’।[17] সহজে অর্থ অনর্থ পরিহার। ঠিক যতটা দরকার, এর বেশি না। সেটা হোক মুখের কথা বা সম্পদ অর্জন। স্বাভাবিক জীবনধারণে ন্যূনতম যতটা না হলেই না, এর বেশি যেকোনও কিছু থেকে বিরত থাকা। বিপরীত দিকে পুঁজিবাদ মানেই বাড়াবাড়ি। পুঁজিবাদী মানসিকতার কেউই অর্থ কামিয়ে কুলিয়ে ওঠে না। যত কামায়, চাহিদা তত বাড়ে। পুঁজিবাদ সাগরজলের মতো। যতই খাবে, পিপাসা বাড়বে। এই সাগরজলে তৃষ্ণা নিবারণ ছাড়িয়ে, মানবজীবনের সহজ-সরল স্বর্গসুধায় টেনে আনেন গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)।

তৃতীয়ত ‘ফানা আনিল এরাদা’।[18] ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের দিকে তাকাই। সে সবকিছুকে দমন করে। নিজের মন মতো না হলেই টিপে ধরে। নিজের ইচ্ছে মতো সবকিছু দরকার তার। এজন্য তাবৎ নারকীয়তা করতে প্রস্তুত। অন্যদিকে ‘ফানা আনিল এরাদা’ এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়, ইচ্ছাকে বলি দেয়া। আমি যা চাই, তা-ই হতে হবে—এমন মানসিকতা থেকে সরে আসা। ‘ফানা আনিল এরাদা’ লালন করলে মানুষ সহনশীল হয় অন্যের মতামত, অধিকার ও অস্তিত্বের প্রতি। দয়াময় হয়, মানবিক হয়। ‘ফানা আনিল এরাদা’র সুফিপরিভাষায় হলো—স্রষ্টার ইচ্ছায় নিজেকে বিলীন করা।[19] অর্থাৎ স্রষ্টার ইচ্ছেই সবচে সুন্দর, এ সত্য স্বীকার করা। ইচ্ছে, অভিপ্রায় এর প্রায় কাছাকাছি শব্দ চাহিদা। মানুষ নিজ চাহিদাকে মহাপ্রতিপালকের প্রতি উৎসর্গিত করলে, সে নিরুত্তাপ হয়। তার মধ্যে থাকে না ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা। সে

---

১৭ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মানব সভ্যতা, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মানব সভ্যতা, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্‌লাকা, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মানব সভ্যতা, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বাস করে, আমি সৎ কর্ম করি, মালিক আমার প্রয়োজন ঠিকই পুরিয়ে দিবেন। এক কথায়—চাহিদা থেকে প্রয়োজনে রূপান্তর হওয়াই 'ফানা আনিল এরাদা'। যেখানে চাহিদার বাড়াবাড়ি নেই, সেখানে অন্যায় কীসের? অধৈর্য কীসের?

মানুষ চাহিদার ঊর্ধ্বে এলে জেগে ওঠে অধ্যাত্মবোধ। সামনের পৃথিবীতে অধ্যাত্ম তাই মৌলিক প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে চলেছে। গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর প্রথম তিনটি কৌশল মানুষকে চাহিদাশূন্য হতে সাহায্য করে, প্রয়োজন বুঝতে শেখায়। সে তিন ধাপ পেরোলেই মানুষকে পায় আধ্যাত্ম পিপাসা।

ঠিক এ কারণেই, চতুর্থ কৌশলে আধ্যাত্মের প্রথম ধাপ আনেন তিনি। আধ্যাত্মের ধাপ মোট চারটি। সব মিলিয়ে গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর মানুষ গড়ার কৌশল সাতটি। এ কৌশল সাতটিকে একত্রে বলা হয় উসুলে সাবআ।[20] বাকি চার ধাপ আজকের প্রতিপাদ্য নয়।

আমাদের প্রাণস্পন্দন আমেনা নন্দন, অতুল-রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ঘটনা মনে এলো। এক ভিক্ষুক এলেন তাঁর কাছে। জানালেন তিনি ক্ষুধার্ত। অতুল-রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে খাওয়ালেন প্রথমে। এরপর বললেন—আপনার কী কী আছে? ভিক্ষুক জানালেন : একটি কম্বল ছাড়া কিছুই নেই। মালিক বললেন কম্বল নিয়ে আসতে। নিয়ে এলে সেটি বিক্রি করলেন। বিক্রির অর্থে কিনলেন একটি কুঠার। এরপর কুঠার ভিক্ষুকের হাতে দিয়ে বললেন—কাঠ কাটুন, জীবিকা অর্জন করুন।[21]

---

২০ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্লাকা, ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

21 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Hadith No: 2197.

এখানে গাউছিয়াত নীতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। খেয়াল করুন, প্রথমকে ভিক্ষুককে কাজে লাগিয়ে দেননি। প্রথমে খাইয়েছেন। এই যে খাওয়ানো, এটি গাউছিয়াতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য : নিঃস্বার্থ সাহায্য করা।

এরপর জিজ্ঞেস করা হলো—কী আছে? কম্বল ছিল। এখানে কম্বল মানুষের লুকোনো সম্পদের উপমা। যাকে মানুষ সম্পদই মনে করে না, তাই তার হাতের পাঁচ হয়ে দেখা দেয়।

কম্বল বিক্রির টাকায় কুঠার কেনা। কম্বলের অল্প টাকায় নিশ্চয়ই উটের ব্যাপারী হওয়া সম্ভব না। সে কল্পনা করাও বাতুলতা, অনর্থ। যা আছে, তাকেই কাজে লাগানো। অর্থাৎ 'ফানা আনিল হাওয়া', অনর্থ পরিহার।

এরপর কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহন। একটু আগেও ভিক্ষুকের কিছুই ছিল না। এখন একটি কুঠার আছে। জীবিকা নির্বাহের জুতসই সুযোগ আছে। এই যে 'নাই' থেকে 'হয়ে যাওয়া'—এটাই স্রষ্টার প্রতি নিজ ইচ্ছেকে বিলীন করা। যে আল্লাহ্ একেবারে 'নাই' থেকে কুঠার বানিয়ে দিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় আমার সবকিছুকে সবচে সুন্দর করে সাজাবেন। এ বিশ্বাস রাখা।

একটি প্রশ্ন হতে পারে, এখন তো ইংরেজ আমল নেই? গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর নীতি কী অকার্যকর? না, অকার্যকর নয়। পৃথিবী হয়তো খাতায় কলমে মুক্ত উপনিবেশবাদ থেকে। কিন্তু নব্য-উপনিবেশবাদ (Neocolonialism) আজ জড়িত সভ্যতার আষ্টেপিষ্টে।[22] আমরা এখনও মননে-আচরণে ঔপনিবেশিকতা ধারণ করি। পুঁজিবাদের উলঙ্গ বিকাশ এখনও চলমান। ফ্রান্স তো এখনও ১৩টি উপনিবেশ থেকে কর আদায় করে চলছে।[23] তা ছাড়া, 'গাউছিয়াত নীতি' যে শুধুই একটি

---

[22] Jean-Paul Sartre (2001)। Colonialism and Neocolonialism। Psychology Press। ISBN 978-0-415-19146-3।

[23] Overseas France - Wikipedia

সময়সীমায় প্রযোজ্য, এমন না। এটি সর্বকালের জন্য। এবং সবার জন্য যে মানুষ তারই জন্য।[24] একটি উদাহরণ দিই।

শুরুর দিকে বলেছি, গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী নৃতত্ত্ব রক্ষা করেছেন, রক্ষা করেছেন মানুষের মৌলিকত্ব। ধনঞ্জয় বড়ুয়া নামক গরিব বৌদ্ধ এলেন গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর কাছে। বারবার অনুরোধ করছিলেন ইসলামে দীক্ষা নিতে। ধনঞ্জয় বলেন—হুজুর, দাস হাজির আছি। হজরত গাউছুল আজম প্রথমে এড়িয়ে যান। বারবার জোরাজুরির ফলে শেষে বলেন—মিঞা, তুমি তোমার ধর্মে থাকো, আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।[25]

এখানে গরিব বৌদ্ধের বাস্তুসংস্থানের কথা ভেবেছেন গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ; ভেবেছেন পারিপার্শ্বিক পরিণতির কথা। এ গরিব মানুষ যদি আজ পোশাকি মুসলিম হয়ে সমাজে ফেরে—ঘরছাড়া হবে, হবে সমাজবিচ্যুত। জান খোয়ানও অসম্ভব না। তাই তাঁকে রক্ষায় এক মহাকৌশল করেন গাউছুল আজম, তুমি তোমার ধর্মে থাকো।

সূরা ফাতিহা, বলা হচ্ছে—সিরাতল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম, চলাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা। কোনও পারার অন্তর্ভুক্ত নয়। ভূমিকাতে বলা হয় বইটির বিষয়বস্তু এবং কীভাবে বইটিকে বুঝতে হবে। সূরা ফাতিহাও তেমনই কুরআনের মৌলিক নির্যাস। বোঝায় কুরআনকে কীভাবে বুঝতে হবে।

---

২৪ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্লাকা, ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং উৎসাহ বর্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্ব সমস্যার মুক্তির দিশারী।

২৫ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্লাকা, ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলা হচ্ছে—যে পথে তোমার ‘প্রিয়জন’ গেছে চলি। আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে এমনভাবে দোয়া করতে, যাতে—আল্লাহ্‌র প্রিয়জনেরা যে পথে গেছেন, আমরাও যেন সে পথে চলি। প্রিয়জনদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্‌র প্রিয়জনদের অনুসরণ করা যায়।

হে বিশ্বাসীগণ, আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রসুলের এবং আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।[26] এখানেও বলা হচ্ছে, আল্লাহ-রসুলের পর মুসলিম উম্মাহ র মধ্যে ‘কর্তৃত্বের অধিকারীদের’ আনুগত্য করতে। ‘কর্তৃত্বের অধিকারী’ শব্দ গুচ্ছের আরবি ‘উলুল আমরি’। অন্যদিকে, গাউছুল আজম অর্থ ‘ত্রাণকর্তৃত্বের অধিকারক’। অর্থাৎ কুরআন অনুপাতে সাব্যস্ত হয় সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর আনুগত্য বৈধ। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শন বলে ইনসানে কামেলের আনুগত্যই খোদার আনুগত্য।[27] তাসাউফশাস্ত্রে ইনসানে কামিল হলেন—সবচে নিখুঁত, পরিপূর্ণ, আদর্শ মানব। যিনি সুফিসাধক শ্রেণিবিন্যাসের নেতৃত্ব দেন। সুফিতত্ত্বের জ্ঞান বণ্টন করেন। এ কারণে তিনি সুফিশ্রেণির কেন্দ্রবিন্দু। মহামহিম ইবনে আরাবি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তাঁর ’ফুসুসুল হিকাম’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা এনেছেন।[28]

প্রতীয়মান হয়েছে, গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) হলেন একজন ‘উলুল আমরে’—কর্তৃত্বের

---

২৬ কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত ৫৯।

২৭ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মূল তত্ত্ব, ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

28 William C Chittick, "Ebn al-‘Arabi Mohyi-al- Din Abu ‘Abd-Allah Mohammad Ta’I Hatemi." Encyclopedia Iranica (1996): Web. 3 Apr 2011. http://iranica.com/articles/ebn-al-arabi Archived 19 July 2011 at the Wayback Machine.

অধিকারক। তাই তাঁর আনুগত্য করাই খোদার হুকুমের আনুগত্য, খোদার আনুগত্য। ধনঞ্জয় যদি গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর আনুগত্য করে, তবে হবে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য।

আর যে খোদার হুকুমের আনুগত্য করে, সে কি মুসলিম, না অন্যকিছু?

হে মমতাময়, অনুরাগী-বিরাগী নির্বিশেষে দয়াশীল, হে প্রতিশোধহীন, হে সর্ববেষ্টনকারী, হে যুগারাম্ভ, হে সমাপক, হে মানবতা রক্ষক, হে গাউছুল আজম, হে সুমহান ত্রাণকর্তা, তুমি এত দয়াময় কেন! এত ভালোবাসো কেন! কেন এত প্রেমময়?

তোমার যুগে জন্মে, পেয়ে আশ্রয় কদমে, গরিব গালিব দাঁড়িয়ে দরদি দরজায়, কৃতজ্ঞতায়, নির্দ্বিধায়, লুটাই ললাট।

লেখক :
সহযোগী সদস্য
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ অর্জনে ‘ফানা আনিল হাওয়া’-র অনবদ্য ভূমিকা

✍ উম্মুল ওয়ারা শাকেরা

যে উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন চাহিদার কোনো ধরনের ক্ষতি না করে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করতে পারে, সে ধরনের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন বলতে সামাজিক সম্পৃক্তিকরণ এবং পরিবেশসম্মত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝায়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করেছে ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’। বাংলাদেশসহ ১৯৩টি দেশ পনেরো বছর মেয়াদি ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে শুধু টেকসই বিশ্ব নয় বরং সমৃদ্ধি, সমতা ও সুবিচারের দিক থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি নতুন এজেন্ডা। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ক্ষমতা এবং বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে ‘রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)’ শিরোনামে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২০১৬ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী বিশ্ব সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত হয়েছে।

২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজি-র ১৭টি লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো– দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গসমতা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়োনিষ্কাশন, টেকসই জ্বালানি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নয়ন অবকাঠামো, বৈষম্য হ্রাসকরণ, টেকসই শহর, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, ভূমির সুরক্ষা, শান্তি ও ন্যায়বিচার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসডিজি-র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০২১ সালের এসডিজি সূচকে বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। চার বছর আগে

২০১৭ সালের সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১২০তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর সব দেশ এ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ; কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি, অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভক্তি তত প্রকট হবে। আর বিভক্তি যত বাড়বে, বিদ্বেষ-বিভেদও তত বাড়তে থাকবে। বর্তমান পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী। এই প্রকট এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। যদিও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। তবে লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও ভোগ বৈষম্য। গত কয়েক বছরে এই বৈষম্য কিছুটা কমেছে; তথাপি বিদ্যমান বৈষম্য প্রকট। আমাদের সম্পদের বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদের মালিক হচ্ছে।

বর্তমান অতি কামনা ও কঠোর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের যুগে সহজসাধ্য উপায়ে মানবাত্মার নফ্স বা কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও রুহে ইনসানির সুপ্রবৃত্তির জাগরণ তথা কলবকে আলোকিত করে চারিত্রিক শুদ্ধির মাধ্যমে খোদায়ি সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মানসে 'মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে'র আধ্যাত্মিক শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা, মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক, খাদেমুল অলদ, গাউসুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সহজে পালনীয় একটি কর্মপদ্ধতির নির্দেশ দেন। রিপুর বিনাশের ত্রিবিধ উপায় বা 'ফানায়ে ছালাছা' ও সংসার মোহমুক্তির চতুর্বিধ পন্থা বা 'মউতে আরবা'র সমন্বয়ে নির্দেশিত উক্ত পন্থাই 'উসুলে সাব'আ' বা সপ্তপদ্ধতি।

সহজ পন্থায় ব্যক্তির আচার নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ এবং একই সাথে অপচয় রোধের একটি উপায় হচ্ছে উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতির অনুসরণ। ‘উসুলে সাব’আর অন্যতম একটি শিক্ষা হচ্ছে মিতব্যয়িতা বা ফানা আনিল হাওয়া। মূলত আল্লাহ্ তা’আলা অপচয়কারীকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সূরা আল আরাফ এর ৩১নং আয়াতে ইরশাদ করেন– “হে আদম সন্তান! তোমরা পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করোনা, আল্লাহ্ তায়ালা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ অর্জনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি, অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরো প্রকট করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভক্তি তত প্রকট হবে। আর বিভক্তি যত বাড়বে, বিদ্বেষ-বিভেদও তত বাড়তে থাকবে। বর্তমান পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী। এই প্রকট এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও ভোগ বৈষম্য। গত কয়েক বছরে এই বৈষম্য কিছুটা কমেছে, তথাপি বিদ্যমান বৈষম্য প্রকট। আমাদের সম্পদের বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদের মালিক হচ্ছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ফলে দারিদ্র্য আরও প্রকট হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এক শ্রেণির মানুষের অবৈধভাবে নদী দখলের ফলে জলজ জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে এবং নদী পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নাগরিক জীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। পাবলিক

ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা টেকসই উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে। জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার অভাব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়–সবক্ষেত্রে বৈষম্য, সমন্বয়হীনতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতাই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে, সেগুলো মোকাবিলায় বেশকিছু করণীয় রয়েছে। যেমন : সবক্ষেত্রে বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে আয়, ভোগ, জেন্ডার, অঞ্চল ও সম্পদ বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে এনে দরিদ্রতার অবসান ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সরকার ও অন্যান্য পর্যায়ে অংশীজনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে সম্পদ আহরণে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে বিশ্লেষণপূর্বক টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে দ্রুত তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। এতে তারা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি সমাজ এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। নীতি-কাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। একই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেনটরিংয়ের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সব মহলের সম্মিলিত অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে 'টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি' কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার জরুরি। পাশাপাশি বিদেশে সম্পদ পাচার বন্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গ্রামীণ অ-কৃষিখাতকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হবে। সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া দুর্গম অঞ্চল বিশেষ বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি। অতিদারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের হার কমাতে প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। নীতিকাঠামো বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি

ন্যায্যভাবে সুবন্টিত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বাড়াতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ও জাগরণ ঘটাতে হবে। জ্বালানি খাতকে বর্তমান বাজেটে অগ্রাধিকার দিলেও তা বাস্তবায়নে কঠোর তদারকি প্রয়োজন। গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্র অনুসন্ধানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার রোধ করতে হবে। সর্বোপরি বলা যায় : 'টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা'গুলো অর্জনে 'গাউছিয়াত নীতি' 'ফানা আনিল হাওয়া'র যথার্থ বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। তবেই বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

যে কোনো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বা যে কোনো উন্নয়নে সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অর্থনৈতিক গতি আরও বাড়াতে এবং একে টেকসই রূপ দিতে সম্পদের অপচয় রোধ এবং মান সম্পন্ন ব্যবহারে কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সবার আগে উৎপাদন এবং ভোগের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে 'গাউছিয়ত নীতি' 'ফানা আনিল হাওয়া'র অনুসরণ বা বাস্তবায়ন করা গেলে তা পরিপূর্ণ ভাবে অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

লেখক :
শিক্ষার্থী, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে 'ফানা আনিল খালক' এর গুরুত্ব

✍ এরশাদ হোসেন (আসাদুজ্জামান)

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আ'লা হাবিবিহিল কারীম; ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আম্মা বা'দ।

মাইজভাণ্ডার আধ্যাত্মিক শরাফতের প্রাণপুরুষ, আওলাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রদত্ত 'উছুলে ছাবয়া' তথা উম্মতে মুহাম্মদির মুক্তির 'সাত মূলনীতি'র প্রথমটি হলো 'ফানা আনিল খালক'।

বলা যায়, আয়না সাগরের সব পানি যেমনভাবে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)'র লোটায় চলে এসেছে; তেমনইভাবে কুরআন-হাদিস তথা শরিয়ত-তরিকত ও মারেফাতের সমস্ত সার হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর 'উছুলে ছাবয়া'তে দেদীপ্যমান। এই সপ্তনীতির অনুশীলনে বান্দা ইনসানে কামেলে রূপান্তর হয়। অতঃপর হুব্বের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে দিদারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরবতে ইলাহি হাসিলে সক্ষম হয়। কুরআন-হাদিসের ভাষ্য মতে, এমন অবস্থায় বান্দার জন্য সাত দোযখ হারাম এবং আট বেহেশত বান্দাকে নিজের বাসিন্দা করার জন্য কামনা করতে থাকে। অতঃপর ঐ বান্দার ইন্তেকাল হলে এমন খুশবু প্রকাশ হয় সমস্ত ফেরেশতারা তাতে মতোয়ারা হয় এবং তাঁকে নিয়ে প্রতিটি আসমানে ফেরেশতারা জুলুছ করতে থাকে।

এক্ষণে মুনিবের দয়া হলে এই অধম গুনাহগার কুরআন-হাদিসের আলোকে সেই মহান 'উছুলে ছাবয়া'র প্রথম মূলনীতি "ফানা আনিল খালক" এর বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

লোকের কাছে দুনিয়াবি কোনো কিছু চাওয়া বা ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকারত্ব এসব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভর হওয়াই 'ফানা আনিল খালক'।

আল্লাহ ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ‘ফানা আনিল খালক’ এর নির্দেশনা :

বান্দা ফরজ নামায আদায় করার পর তার ও পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হালাল রোজগারের জন্য আত্মনিয়োগ করবে এটাই মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ। দৈহিক শক্তি ও মানসিক সুস্থতা থাকা সত্ত্বেও অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া এটা আল্লাহ্‌র অপছন্দ। এজন্য মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾

অতঃপর যখন নামায শেষ হলো, তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করো আর আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করো এ আশায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করবে। (সুরা জুমুআ : ১০)

প্রিয় আকা হযরত রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ

তোমাদের কারও জন্য তার রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হওয়া মানুষের নিকট তার ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। (বুখারি শরিফ, অধ্যায় : ৩৪, بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ১৯৪৫)

প্রিয় আকা হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন :

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

তোমাদের কেউ রশি নিয়ে খড়ির আঁটি বেঁধে তা বিক্রি করে, এতে আল্লাহ তা‘আলা তার সম্মান রক্ষা করেন, এটা তার জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম লোকজনের নিকট এমন চাওয়ার চেয়ে, যে চাওয়ায় কিছু পাওয়া যেতে পারে বা না-ও পারে। (বুখারি শরিফ, অধ্যায় : ৪২, بَاب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ২২১৭)

আরও ইরশাদ করেন :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনও কেউ খায় না। আল্লাহ্‌র নবি দাঊদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।" (বুখারি শরিফ, অধ্যায় : ৩৪, بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ১৯৪২)

'ফানা আনিল খালক'- এর চর্চা করলে আল্লাহপাক স্বাবলম্বী করে দেন :

পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করে বান্দা যখন আত্মনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টায় নেমে যায় তখন আল্লাহ পাক বান্দাকে সাহায্য করেন। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন :

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾

এবং এ যে, মানুষ পাবে না, কিন্তু আপন প্রচেষ্টা। (সূরা আন-নাজম : ৩৯)

অর্থ্যাৎ অর্জন করতে হলে মানুষকে চেষ্টা বা পরিশ্রম করতে হবে।

এ ব্যাপারে হাদিসে পাকে এসেছে :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ

উপরের হাত (দানকারীর হাত) নিচের হাত (যাঞ্চাকারীর হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সদাকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। (বুখারি শরিফ, অধ্যায় : ২৪, بَاب لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ১৩৪১)

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: تَعْلَمُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَأَنَّ الْإِيَاسَ غِنًى وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَئِسَ عَن شَيْءٍ اسْتَغْنى عَنهُ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

'হযরত উমার ফারূক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত : তিনি লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকেরা! মনে রাখবে লোভ লালসা এক রকমের মুখাপেক্ষিতা। আর মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা, ধনী হওয়ার লক্ষণ। মানুষ যখন অন্যের কাছে কোনো কিছু আশা করা ত্যাগ করে, তখন সে স্বনির্ভর হয়। (রযীন বর্ণিত সূত্র : মিশকাতুল মাসাবিহ, ১৮৫৬নং হাদিস)

'ফানা আনিল খালক'-এর প্রতি অনীহা তথা ভিক্ষাবৃত্তির পরিণতি :

জবানে নববিতে ইরশাদ হয়েছে :

" لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ " .

"তোমাদের কেউ কেউ মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে চাইতে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে তার মুখমণ্ডলে গোশতের কোন টুকরা অবশিষ্ট থাকবে না।"(সহিহ মুসলিম, অধ্যায়-১৩, باب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ, হাদিস নং-২২৮৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে :

"مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ"

"যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়না ছাড়াই) নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে বাড়ায় বস্তুত সে আগুনের ফুলকি ভিক্ষা করছে। কাজেই এখন তার ভেবে দেখা উচিত সে বেশি নিবে না কম নিবে।" (সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : ১৩,باب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২২৬৭)

দরবারে নববিতে হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ফানা আনিল খালক'-এর দীক্ষা :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ " أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ؟ " . قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ " ائْتِنِي بِهِمَا " . فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِي مني هَذَيْنِ؟ " . قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ . قَالَ " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ " اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ " . فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ " اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ" .

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সূত্রে বর্ণিত। একদা হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক আনসারি

ব্যক্তি এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার ঘরে কিছু আছে কি? সে বললো, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। একটি পাত্রও আছে, তাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো, লোকটি তা নিয়ে এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বললেন : এ দুটি বস্তু কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহামে নেবো। তিনি দুইবার অথবা তিনবার বললেন: কেউ এর অধিক মূল্য দিবে কি? আরেকজন বললো, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা প্রদান করে দিরহাম দু'টি নিলেন এবং ঐ আনসারিকে তা প্রদান করে বললেন : এক দিরহামে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও এবং আরেক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো।

লোকটি তা-ই করলো। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তাতে একটি হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন : যাও, তুমি কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। পনের দিন যেন আমি আর তোমাকে না দেখি। লোকটি চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করতে লাগলো। অতঃপর সে এলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম ছিলো। সে এর থেকে কিছু দিয়ে কাপড় এবং কিছু দিয়ে খাবার কিনলো। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম; কেননা ভিক্ষার কারণে কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে একটি বিশ্রি কালো দাগ থাকতো। ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য বৈধ নয়। (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর ঋণ আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম। সূত্র : সুনান আবু দাউদ : ১৬৪১, তিরমিযি (অধ্যায় : যাকাত, ১২১৮), নাসায়ি (অধ্যায় : ব্যবসা, ৪৫২০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় : তিজারাত, ২১৯৮), আহমদ।

'ফানা আনিল খালক' ব্যতীত তাওয়াক্কুল হয় না :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: " كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) [البقرة: ١٩٧] الْآيَةَ "

হযরত ইবনে ‘আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সূত্রে বর্ণিত : তিনি বলেন, লোকজন হজ করতো কিন্তু সাথে পাথেয় নিয়ে আসতো না। আবু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, ইয়ামেনের কতিপয় লোক হজে যেতো কিন্তু সাথে পাথেয় আনতো না এবং তারা বলতো যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করেছি; অথচ মক্কায় পৌঁছার পর তারা ভিক্ষা করতো। ফলে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, “তোমরা হজের সফরে পাথেয় নিয়ে যাবে, আর জেনে রেখো তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়।” (২ : ১৯৭) (সুনান আবু দাউদ, অধ্যায় : ৫, بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ, বুখারি, নাসাঈ)

‘ফানা আনিল খালক’ চর্চাকারী বান্দাকে আল্লাহ ভালবাসেন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمْ على عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ والتَّبَاؤُسَ ويُبْغِضُ السَّائِلَ المُلْحِفَ ويحِبُّ الحَيَّ العَفيفَ المُتَعفِّفَ

হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে কোনো সম্পদ দান করেন, তখন তিনি তার চিহ্ন ঐ বান্দার উপর দেখা যাক তা পছন্দ করেন। আর তিনি অভাব ও দীনতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন। নাছোড়-বান্দা হয়ে ভিক্ষাকারীকে ঘৃণা করেন এবং লজ্জাশীল ও ভিক্ষা করে না এমন পবিত্র মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। (ইমাম বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬২০২, সহিহুল জামে ১৭১১)

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ، يَقُولُ: «إنَّ الله يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيّ الْخَفِيَّ». رواه مسلم

সা‘দ ইবনে আবি অক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী ও আত্মগোপনকারী।” (মুসলিম : ২৯৬৫, আহমদ : ১৪৪৪, ১৫৩২)

‘ফানা আনিল খালক’ চর্চায় বেলায়তের শাহানশাহ মওলা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণিত প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর শেখানো আমল :

وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه: أَنَّ مُكَاتِباً جَاءَهُ فَقَالَ: إنّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنّي، قَالَ: ألاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ

مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ: «اَللهم اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

হযরত মওলা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন 'মুকাতিব' (লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ কৃতদাস) তাঁর নিকট এসে নিবেদন করল, 'আমি আমার নির্ধারিত অর্থ দিতে অপারগ, অতএব, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।' (একথা শুনে) তিনি বললেন, 'তোমাকে কি এমন দো'য়া শিখিয়ে দেবো না, যা হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর পর্বত সমপরিমাণ ঋণও থাকে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দেবেন। বলো, 'আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়া-ক।'

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযি দিয়ে আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও হারাম রুযি থেকে এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করো। (তিরমিযি হাসান) (সূত্র : রিয়াযুস সালেহিন, بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ হাদিস : ১৪৯৪)

পরিশেষে বলতে হয়, কুরআন ও হাদিসের আলোকে 'ফানা আনিল খালক' এর গুরুত্ব এখানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার আরো ব্যাপক আলোচনা কোরআন-হাদিসের মধ্যে মণিমুক্তোর মতো বিদ্যমান। আল্লাহপাক আমাদেরকে 'ফানা আনিল খালক' এর পরিপূর্ণ আমল করার মাধ্যমে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'-র মহান আদর্শে আদর্শিত হওয়ার তৌফিক দান করুন, আ-মী-ন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

লেখক :
দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধি
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
উত্তর খিরাম দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

'অনর্থেরি পরিহারে তাক্ওয়ার ঝলক দেখেছি' : 'ফানা আনিল হাওয়া'-র আলোকে পর্যালোচনা

✍ শেখ শাকিল মাহমুদ

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সব সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট কাজ দিয়েছেন। ফেরেশতাদের যার যার কাজ নির্ধারিত। যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। যিনি বসে আছেন তিনি অনন্তকাল ধরে বসে আছেন; কিন্তু মানুষকে, তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, ইচ্ছার স্বাধীনতা। সুতরাং, মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা বিরাজমান-একটি তার দেহ-নির্ভর নফ্স বা প্রবৃত্তি, অন্যটি তার মধ্যে আল্লাহর হুকুম (রুহ)। একটির প্রবণতা হচ্ছে মঙ্গল, সত্য এবং সুন্দরের দিকে। অন্যটির প্রবণতা হচ্ছে পশু প্রবৃত্তির দিকে যা তাকে সহজে আকর্ষণ করে। এ দু'য়ের মাঝে তার বিবেক স্থাপিত একটি প্রদীপের মতো। সে প্রদীপ তাকে কোনোদিন আলো দেখাবে সেটা নির্ভর করবে তার নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বভাবের উপর। তার দেহ যে চারটি উপাদান দিয়ে তৈরি তার উপর।

মানুষকে আল্লাহ তিনটি ক্ষমতা দিয়েছেন :

ক. চরম মঙ্গল অর্জনের ক্ষমতা।

খ. চরম অমঙ্গলের ক্ষমতা।

গ. মঙ্গল ও অমঙ্গলের তারতম্য বুঝতে পারার ক্ষমতা।

মানুষের মধ্যে যে দু'টি সত্তা রয়েছে তার মধ্যে মানুষের প্রকৃতিতে পশুসত্তাই প্রবল। যে চারটি উপাদান দিয়ে মানুষের দেহ তৈরি তা হলো : আগুন, বাতাস, মাটি ও পানি। এর অনুপাত অনুসারেই মানুষের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, এই উপাদানগুলো যেভাবে উপকারী বটে, কিন্তু সেগুলো যখন সীমার অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন সেগুলো খুবই ক্ষতিকারক। এই ক্ষতিকারক দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মানবতার বিকাশ ঘটানোর নামই আধ্যাত্মিক সাধনা বা তাসাউফ চর্চা। তাসাউফ চর্চার উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের

উপযোগী করে তোলা। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতের মায়া-মোহ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির সন্ধানই হলো তাসাউফ। আল্লাহ তা'আলার নিগূঢ় রহস্য তালাশ, আত্মার পবিত্রতা এবং মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধনের ওপর ভিত্তি করেই সুফিবাদের উৎপত্তি। সুফিগণ সাদা-সিধা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন এবং সর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আল্লাহ্‌র প্রেমের অনুসন্ধান তথা পরম সত্তাকে জানার প্রয়াসই তাসাউফ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে আত্মাকে পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখার মাধ্যমে জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সফলতা পেয়েছে, যে তাকে [আত্মাকে] পবিত্র করেছে [অপকর্ম থেকে এবং তাতে সৎকর্মের লালন করেছে]। নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে যে একে [পাপে] কলুষিত করেছে [এবং সৎকর্মকে দাবিয়ে রেখেছে]। (সূরা আশ-শামস : আয়াত ৯-১০)

তরিকত তাসাউফ দর্শনেরই একটি পরিভাষা ও ইসলামে সমর্থিত আত্মশুদ্ধির পন্থা। পার্থিব ও পরকালীন সকল বিষয়ে সাফল্যের জন্য ওসিলা বা মাধ্যম অপরিহার্য। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য যেমনইভাবে যোগ্য শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ছাড়া পূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়; তেমনইভাবে ইসলামের যথাযথ অনুসরণ করত উভয় জগতের পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও মাধ্যম ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় করো। খোদার দিকে উপায় বা ওসিলা তালাশ করো। আল্লাহর রাস্তাতে চেষ্টিত হও; তা হইলে তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা মায়িদাহ : আয়াত ৩৫) সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ওসিলা তালাশের জন্য আল্লাহ কুরআনেই নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ মাধ্যম বলতে বিভিন্ন ব্যাখ্যায় যে বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে কামেল পীর বা মুর্শিদ অন্যতম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য [কোনো] পথপ্রদর্শক নেই।" (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ১৮৬)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, "যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কোনো ওলি মুর্শিদ [অর্থাৎ পথপ্রদর্শক সাহায্যকারী] পাবেন না।" (সূরা কাহাফ : আয়াত ১৭) মুর্শিদ বা কামিল পীরের হাতে বায়াত গ্রহণের পরে তাঁরই সোহবতে থেকে কুপ্রবৃত্তির সকল মোকাবিলা করে মনজিলে মকছুদে পৌঁছতে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। বায়াত গ্রহণের পর এ মর্মে

আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই যে, আমার আর কিছুই করতে হবে না; পীর আমাকে পার করে দেবেন। এটা এক ধরনের শয়তানি ধোঁকা হতে পারে। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর যেমন ছাত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক আইন মেনে অবশ্যই চলতে হয়, তেমনিভাবে তরিকতের দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তিও আইনের আওতায় এসে যায় এবং সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তার সঠিক অনুশীলন অপরিহার্য।

যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন তরিকতের শায়খগণ মানুষের হিদায়াত ও আত্মশুদ্ধির জন্য পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামি শরিয়তের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "(হে প্রিয় রাসুল!) আপনি আপনার প্রভুর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন।" (সূরা আন নাহল : আয়াত ১২৫)

'উছুলে ছাবয়া' অর্থাৎ 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' হলো গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত বিশ্ব মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের লক্ষ্যে তাসাউফ চর্চায় তরিকতের একটি প্রজ্ঞাময় কর্মপদ্ধতি। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সত্যিই এক বিরাট নিয়ামত এ সপ্তকর্মপদ্ধতি।

'উছুলে ছাবয়া' বা 'সপ্তকর্মপদ্ধতি'কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১। 'ফানায়ে ছালাছা' বা আত্মশুদ্ধির ত্রিবিধ বিনাশ।
২। 'মউতে আরবায়া' বা চতুর্বিধ বাসনার মৃত্যু বরণ।

'ফানায়ে ছালাছা' বা আত্মশুদ্ধির ত্রিবিধ বিনাশকে সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'মানব সভ্যতা' কিতাবে 'গাউছিয়ত নীতি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

'ফানায়ে ছালাছা' অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির ত্রিবিধ বিনাশ হলো:

১। ফানা আনিল খাল্ক।
২। ফানা আনিল হাওয়া।
৩। ফানা আনিল এরাদা।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা 'ফানা আনিল' হাওয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

ফানা আনিল হাওয়া :

'ফানা', 'আন' ও 'হাওয়া' তিনটি শব্দই আরবি। 'ফানা' শব্দের অর্থ ধ্বংস, ক্ষয়, বিনাশ, বিলোপ, লয়, শেষ, নিঃশেষ, মৃত্যু।

আর 'আন' অর্থ থেকে, হতে, সম্বন্ধে, ব্যাপারে, বিষয়ে, কারণে, পরে, দিকে।

'হাওয়া' অর্থ কামনা, বাসনা, ভালোবাসা, আবেগ, অনুরাগ, ঝোঁক, পছন্দ, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, খেয়াল ইত্যাদি।

সুফি-পরিভাষায় 'ফানা আনিল হাওয়া' অর্থ যা না হলে জীবন চলে, সে সব কাজ-কর্ম মুক্ত হয়ে জীবন পরিচালনা করা, যা সামগ্রিকভাবে জীবনকে কালিমামুক্ত করে।

'ফানা আনিল হাওয়া' এর ব্যাখায় সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) *বেলায়তে মোত্‌লাকা*য় উল্লেখ করেছেন, "ফানা আনিল হা'ওয়া" অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামিলা মুক্ত হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত শিরোনামের প্রথম অংশটি সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর উক্তি বিশেষ। যেটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দু'টি বিষয় প্রস্ফুটিত হয়। একটি হলো : অনর্থ পরিহার; আর অপরটি হলো তাকওয়া।

অনর্থ পরিহার :

'অনর্থ পরিহার করা'র বিষয়ে প্রথমে যেটি আসে তা হলো উপকারহীন কথা বর্জন করা। প্রথমে নিজেকে সব অনর্থ কথা থেকে বিরত রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন : "নিশ্চয় মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনয়-নম্র হয়েছে এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করে না" (সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত ১-৩)। মানুষের মুখের কথা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। সঠিকভাবে এ নিয়ামতের ব্যবহার করা জরুরি অন্যথা এটা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। কেননা মানুষের মুখে উচ্চারিত প্রতিটি কথা মহান আল্লাহর দরবারে সংরক্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন, "সে মুখ দিয়ে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারে না, এ ছাড়া যে, তার পাশে একজন পর্যবেক্ষক [লেখার জন্য] সদা প্রস্তুত থাকে।" (সূরা কাফ : আয়াত ১৮)। তাই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা ও সংযত কথাবার্তা বলা মানুষের জন্য অবশ্য করণীয়।

কারণ, এ জিহ্বাই মানুষকে ক্ষতির মধ্যে নিপতিত করে। পক্ষান্তরে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পরকালে নাজাত পাওয়া ও জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আছ-ছাকাফি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হ'তে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক ভীতিকর বস্তু কোন্‌টি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন, এটি।" [তিরমিযি হা/২৪১০; মিশকাত হা/৪৮৪৩, সনদ ছহিহ।]

শুধু মুখের কথার কারণেই অনেক সময় মানুষকে অনেক বড়ো বিপদে পড়ে যেতে হয়। এ কারণে আমাদের উচিত অনর্থক কথাবার্তা ত্যাগ করা। কখনও কখনও একটি কথা সারা জীবনের দুঃখের কারণ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি কথাই মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারে; মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুজানি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কখনও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা তার এ কথার কারণে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কখনও আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে চিন্তাও করে না যে তা কোন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। অথচ এ কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন। (তিরমিজি : হাদিস - ২৩১৯)

এর প্রমাণ ইবলিস শয়তান। একটি কথাই তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত করে দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, " হে ইবলিস! তোমাকে এ [মহান অস্তিত্বকে]-কে সিজদা করতে কে বাধা দিয়েছে, যাকে আমি নিজে আমার [পবিত্র] হাতে তৈরি করেছি? তুমি কি অহংকার করেছ, নাকি তুমি [তোমার ধারণামতে] উচ্চ মর্যাদাবান ছিলে? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছেন আর তাকে মাটি দিয়ে বানিয়েছেন। ইরশাদ হলো, অতএব, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও; নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। নিশ্চয়ই তোমার জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত লা'নত থাকবে।" (সূরা সোয়াদ : আয়াত ৭৫-৭৮)

মানুষকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যেও অনর্থক কথা বলার অনুমতি নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "লোকদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও আছে যারা অজ্ঞতা বশত অসার বাক্য ক্রয় করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করা যায় এবং একে [আল্লাহর হিদায়াত] ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এসব লোকের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা লোকমান : আয়াত ৬)

আর যদি সে কথাগুলো হয় মানুষকে কষ্ট দেওয়া, তা তো আরও বিপজ্জনক। কবি ইয়াকুব হামদুনি বলেছেন, 'তরবারির ক্ষতের আরোগ্য আছে, কিন্তু জিবের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতের আরোগ্য নেই। ' (তাজুল উরুস : পৃষ্ঠা ৩৭৩)

যারা মুমিন, তারা এমন করতে পারে না। হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মুমিন কখনও দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী হয় না।" (তিরমিজি : হাদিস - ২০১৩)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বললে বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ভুল মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয়ই বান্দা কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা বলে, অথচ সে কথা সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই; কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার, বান্দা কখনও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে, যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই; অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" [বুখারি হা/৬৪৭৮; মুসলিম হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৫৮১৫ ।]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'বান্দা এমন কথা বলে, যার ফলে সে জাহান্নামের এত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়; যা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়ে অধিক'। [মুসলিম : হা/২৯৮৮]

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এক সময় তাঁর হুজুরা শরিফে একজন লোক প্রবেশ করতে চাইলে তিনি হঠাৎ বলেন, "এখানে আসিয়োনা। এখানে 'হাওয়া' দাফন করা হইয়াছে। ইহা বাবা আদমের কবর।" তাঁর উপর্যুক্ত উক্তিতে বোঝা যায়, অনর্থক কাজ পরিত্যাগ না করে তাঁর নিকট এলে কোনো কাজ হবে না। যেহেতু হাওয়া বা অনর্থক প্রবৃত্তিকে এখানে দাফন করা বা বিনষ্ট করা হয়। "ইহা বাবা আদমের কবর" অর্থ ইহা বেলায়তে মোত্‌লাকার আদি পুরুষ অনর্থ বিনাশকারীর অবস্থান ক্ষেত্র। যেমন কুরআনে পাক বলেন : "যে কেউ খোদার নিকট উপস্থিতি সময়ের ভয়ে নিজ প্রবৃত্তিকে

অনর্থক কাজ হইতে বিরত রাখে বেহেশত তার নিশ্চিত ঠিকানা।” (সূরা আন নাজেয়াত : আয়াত ৩১, ৩২) [সূত্র : *বেলায়তে মোত্‌লাকা*, DIRI সংস্করণ পৃষ্ঠা ১০৭]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, অপ্রয়োজনে অধিক কথা বলা বা বাচালতা পরিহার করা মুমিনের জন্য জরুরি। কেননা এটা আল্লাহর অসন্তোষের কারণ। কথা মার্জিত, নম্র ও নিম্নস্বরে বলার চেষ্টা করতে হবে। অতএব, আমাদের সবার উচিত, সব ধরনের অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মনোনিবেশ করা। অনর্থক কথার পাশাপাশি অনর্থক কাজ মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা।’ (তিরমিজি : হাদিস - ২৩১৮) ‘ফানা আনিল হাওয়া’ বা ‘অনর্থ পরিহার’ উভয় জগতের সফলতা ও উন্নয়নের অন্যতম কৌশল। ‘ফানা আনিল হাওয়া’ চর্চার মাধ্যমে সব অনর্থ পরিহারপূর্বক প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি লাভ পূর্বক আল্লাহ তায়ালার খাঁটি বান্দা হয়ে উভয় জগতের কামিয়াবি অর্জন করা সম্ভব।

তাকওয়া :

‘তাকওয়া’ কুরআন-হাদিসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হলো : একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাকে মুত্তাকি বলা হয়। ঈমানদারের মহৎ গুণাবলির মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। যার মধ্যে তাকওয়া থাকে, সে পার্থিব জীবনের লোভে কেনো খারাপ কাজ করে না। সে পরকালীন জীবনের কল্যাণের কাজে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে : জীবনের প্রতিটি কাজকর্মে আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা, সকল প্রকার অনিষ্ট কাজ থেকে আল্লাহর ভয়ে নিজেকে বাঁচানোর নামই হলো- তাকওয়া। তাকওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মুমিন পরিশুদ্ধতা লাভ করে। ঈমানশুদ্ধতার আত্মিক সুখ-শান্তি লাভ করে। তাই একজন মানুষকে মানুষ হতে হলে সর্বাগ্রে তাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর ভয় যদি সদা অন্তরে জাগ্রত না থাকে, তা হলে তার দ্বারা ভালো কাজের আশা করা যায় না। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দুর্নীতি করা যায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, দায়িত্বে অবহেলা করা যায়, আমানতের খিয়ানত করা যায়; কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাই প্রতিটি মানুষের তাকওয়া অর্জন করা অপরিহার্য। তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অনেক বর্ণনা রয়েছে। মুত্তাকিদের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২)

তাকওয়া দৃশ্যমান কোনো বস্তু নয়। এটা মূলত মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণবিশেষ। তাকওয়ার স্থান সম্পর্কে হযরত রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এখানে থাকে, এ কথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন। তাকওয়া যেহেতু অন্তরে থাকে, তাই হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তর পরিষ্কার করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মনে রেখো, নিশ্চয়ই মানুষের দেহে একটি গোশতের টুকরো আছে, যা ঠিক থাকলে সমস্ত দেহই ঠিক থাকে। আর তার বিকৃতি ঘটলে সমস্ত দেহেরই বিকৃতি ঘটে। আর তা হচ্ছে অন্তর বা কলব। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবিরা গুনাহ, অশ্লীল কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে, তাকে মুত্তাকি বলা হয়।" মুত্তাকি ব্যক্তি সততা, আমানতদারিতা, ধৈর্য, শোকর, আদেল-ইনসাফ সব ধরনের গুণে গুণান্বিত হন।

তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত ভালোবাসা। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৬)। সূরা মায়িদাহ ২৭ নং আয়াতের মর্মার্থে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দার আমল ইবাদত কবুল করেন। তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দার কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করেছে, তবে তার কোনো ভয় নেই এবং কোনো দুশ্চিন্তাও তাকে গ্রাস করবে না।" (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৫)। তাকওয়া অবলম্বনকারীর কাজ আল্লাহ সহজ করে দিবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে তাকওয়া অবলম্বন করলো, আল্লাহ তার জন্যে কাজগুলোকে সহজ করে দিবেন। (সূরা ত্বালাক, আয়াত ৪)। সূরা তালাকের ২ নং আয়াতে বোঝা যায়, তাকওয়া অবলম্বনকারীকে আল্লাহতায়ালা পরিমিত রিজিক দান করেন; যে কেউ আল্লাহতায়ালার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার জন্য সঙ্কট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দিবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দিবেন যা তার ধারণারও বাইরে। পবিত্র কুরআনের আলোকে

প্রতিয়মান হয় যে, কেউ তাকওয়া সংবলিত সুন্দর চরিত্র নির্মাণ করতে পারলে তার রিজিকের অভাব হয় না।

তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দার জন্যে জমিন ও আসমানের বরকতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তা হলে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের বরকতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা [সত্যকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতএব, তারা যা করত সে কৃতকর্মের কারণে আমি তাদের পাকড়াও করেছি।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৯৬)

কুরআন হাদিস গবেষণা করলে দেখা যায়, তাকওয়ার ক্ষেত্র ও পরিধি সীমাহীন বিস্তৃত। এটি যেকোনো ধরনের পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করে, সব মন্দ ও অশ্লীল কথা, কাজ ও পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে রাখে। প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি ও দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়ে নিজের ক্ষতি করা থেকে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের ক্ষতি করা থেকে রক্ষা করে। তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দার ভেতরে হক-বাতিল বোঝার ও পার্থক্য করার বিবেক সৃষ্টি হয়। সত্য-মিথ্যা অনুধাবন করা যায়। তাকওয়া জীবনকে এমন এক ভিত্তির ওপর স্থাপন করে, যা সব ধরনের ভীতি, লোভ-লালসা, প্ররোচনা, প্রতারণা, প্রলোভন, পদস্খলন থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখে।

মানুষ দুনিয়ায় মধ্যে থেকেই কীভাবে সহজে উন্নততর চরম স্তরে পৌঁছানো যায়, তা 'ফানা আনিল হাওয়া' পর্যালোচনা করলে সহজে অনুমেয় হয়। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এ পথকে খুবই সহজে মানব সম্মুখে দিয়ে গিয়েছেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী-র (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মহান আদর্শ ও নীতিমালাকে তথা তরিকা, ছিলছিলা, শজরা, উছুল, উছুলে ছাবয়া, গাউছিয়ত নীতির হিদায়াত বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শজরার ধারাবাহিকতায় খেলাফতপ্রাপ্ত একমাত্র মনোনীত বর্তমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) বিভিন্ন যুগোপযোগী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁরই নির্দেশনায় বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট'- প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুফিবাদ ও ইসলাম বিষয়ক বিদ্যায়তনিক গবেষণা, নানা বিষয়ের উপর জনসচেতনতামূলক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আন্তর্জাতিক ই-কনফারেন্স, সুফি সংলাপ ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন করে আসছে। এর

পাশাপাশি সুফিবাদ বিষয়ক বই-প্রকাশ, জনসচেতনতামূলক লিফলেট এবং একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করে যাচ্ছে। বিদ্যায়তনিক গবেষণার পাশপাশি তিনি মাঠ পর্যায়ে বিশেষত 'মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়ার' অনুসারীদের 'উছুলে ছাবয়া' অনুশীলনের মাধ্যমে তরিকত চর্চা করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বেলায়তে মোত্লাকা কিতাবে বলা হয়েছে, "বিশ্ব সভ্যতা যেইভাবে কামনা বাসনা, অনর্থ অপচয়ের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তৎমুক্তির জন্য এই সুফি সভ্যতার নীতিমালা সপ্ত পদ্ধতির অনুসরণ অনিবার্য।"

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী-র (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) জীবদ্দশায় সর্বশেষ রচিত গ্রন্থ *মানব সভ্যতা* কিতাবের শেষ লাইনটি দিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানলাম :

> "পরকালীন 'বেহেশত' স্বর্গের খোদায়ী সনদ হাসিল মুক্তি লাভ করিতে হইলে অনর্থ পরিহার যাহা না হইলে চলে সেই কাজ, ব্যবহার ও কথা পরিত্যাগ একান্ত দরকার যাহা পবিত্র কোরানের সুরায়ে 'নাজেয়াতের' ৪০ ও ৪১ আয়াতে বিঘোষিত আছে। ইহা অকাট্য সত্য, উপরোক্ত **ফানায়ে ছালাছার 'গাউছিয়ত নীতিই' মুক্তির দিশারি**।"

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল কুরআন (রুহুল কোরআন, সুফি মিজান ফাউন্ডেশন)
২. বেলায়তে মোত্লাকা, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
৩. মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
৪. মানব সভ্যতা, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
৫. উছুলে ছাবয়া স্মারক গ্রন্থ, সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)
৬. জ্ঞানের আলো, সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

লেখক :
কো-অর্ডিনেটর, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI),
সাধারণ সম্পাদক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

মটো

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে
বাক-বিতন্ডা পরিহারে
জানার আগ্রহে,
পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে
না দেখাইবে "পীর" যাকে এই তিন ধারা
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা।

"মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি
তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ
তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে,
তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে
আজি তোমারই বাসরে।"

– সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ)

নোট

নোট

নোট

গাউছিয়ত নীতি

(স্মারক গ্রন্থ)

ISBN : 978-984-35-3673-0